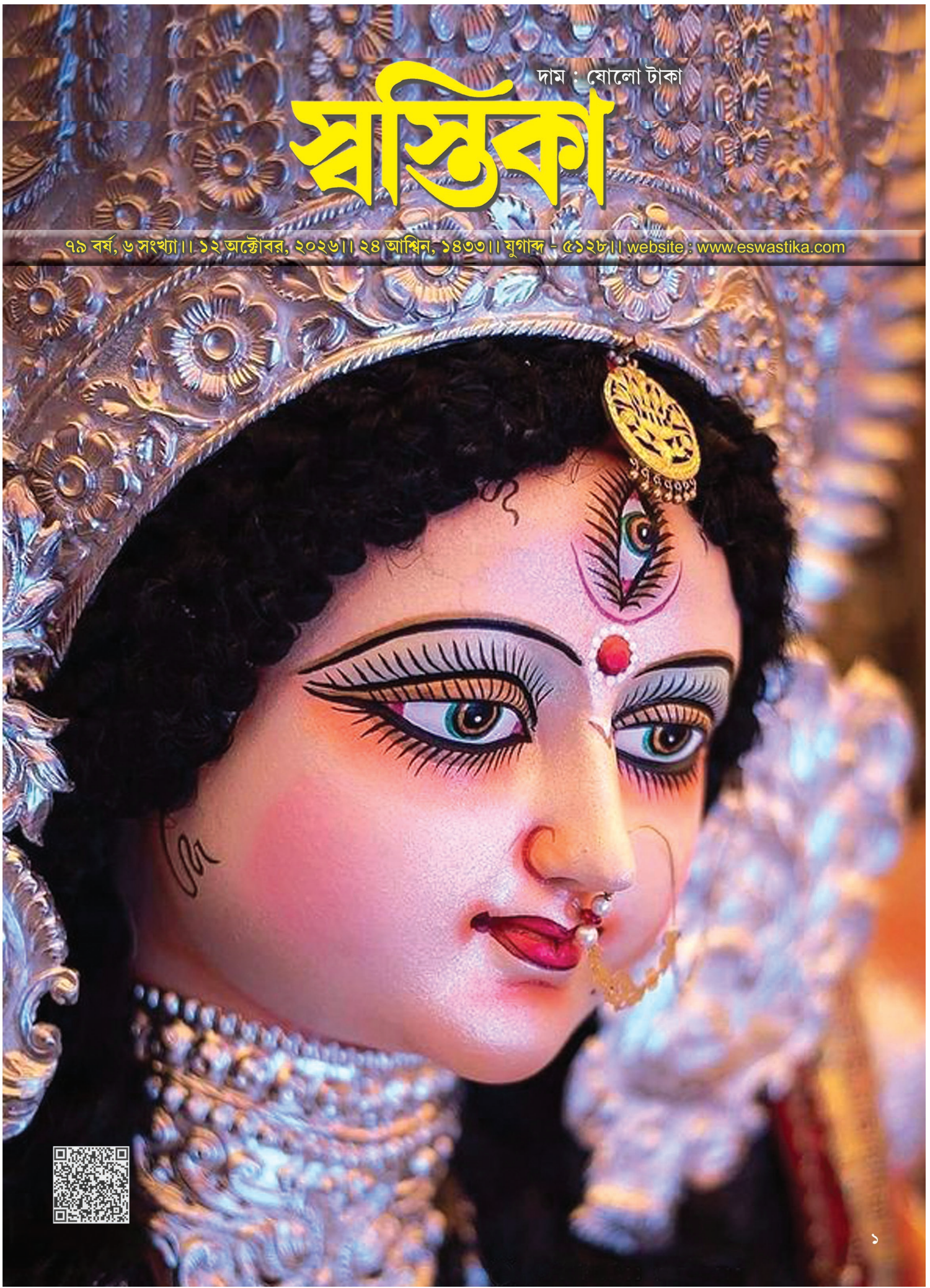

দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ১২ অক্টোবর, ২০২৬।। ২৪ আশ্বিন, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

कुटुंब प्रबोधन

जीवन यात्रा की नौका है परिवार,
जिसमे हम सात जन साथ हैं,
भवसागर पार करने हेतु

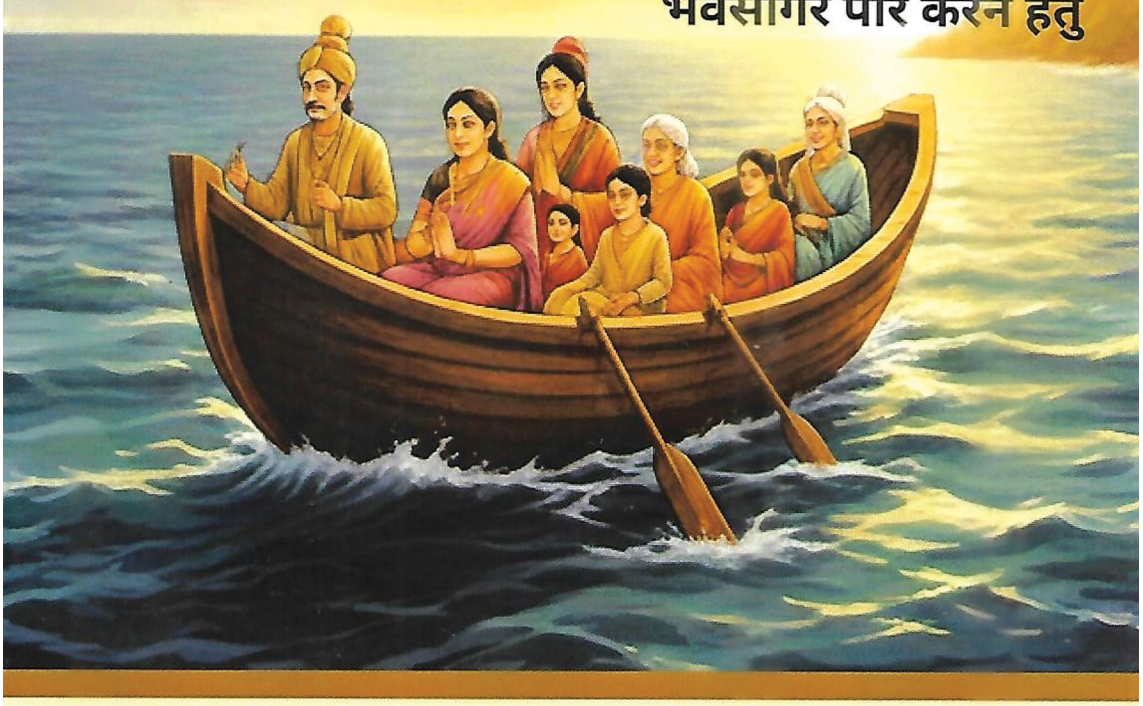

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৯ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ২৪ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১২ অক্টোবর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

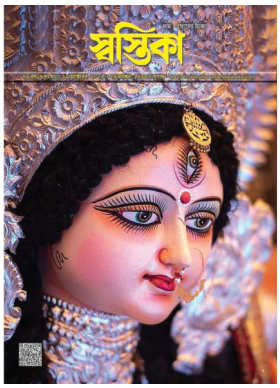

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবলে বিরোধীশূন্যতার ভাবনা মান্যতা পাবেই—'ভদ্রতা ও দুর্বলতা' ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দিদি গো! সেরা অভিনেত্রী পুরস্কার হাতছাড়া ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

অশোক সিঞ্চলজী : এক কর্মযোগী ☐ দত্তাত্রেয় হোসবলে ☐ ৮

'দুর্গাপূজা'র বিষয়ে মিথ্যে ন্যারেটিভ ফেরি করার পিছনে বাজারি সংবাদমাধ্যমের কায়েমি স্বার্থ রয়েছে ☐ কৌটিল্য ☐ ১০

বাঙ্গালির দুর্গাপূজা : ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা, শিল্প ও ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার এক জীবন্ত মহোৎসব ☐ ডঃ সমীর চন্দ্র দাস ☐ ১১

বীরত্বের আরাধনা ও চর্চাই দুর্গাপূজার একমাত্র পন্থা ও উদ্দেশ্য ☐ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ☐ ১৫

আত্মসাধনার প্রতীক দুর্গাপূজা ☐ শুভেন্দু সরকার ☐ ১৮

বাগবাজারের দুর্গাপূজার আড়ালে এক ইতিহাস, এক বিকল্পের উত্তাপ ☐ সৈকত নিয়োগী ☐ ১৯

মানিকতলা সাধুখাঁ বাড়ির একশো পঁচিশ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গাপূজা ☐ সপ্তর্ষি ঘোষ ☐ ২২

ঐতিহ্য ও পরম্পরার জীবন্ত দলিল : পাঁচথুপির দুর্গাপূজা ☐ জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ ☐ ২৩

পানাগড়ের নিকটস্থ সোঁয়াই গ্রামে মুখোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা ☐ বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ☐ ২৫

বর্ধমান রাজবাড়ির দুর্গাপূজা : ঐতিহ্য, প্রেক্ষাপট ও উপাচারের বহুমাত্রিক মিশ্রণ ☐ অত্রি মল্লিক ☐ ২৭

হিমের দেশে হৈমবতী—জার্মানির দুর্গাপূজা ☐ দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী ☐ ২৯

মা দুর্গার পবিত্র বৃক্ষরূপ কলাবউ ☐ সাগরিকা ভট্টাচার্য ☐ ৩১

লোকশিল্পে ও লোকসংস্কৃতিতে মা দুর্গা ☐ বৈশাখী কুণ্ডু ☐ ৩৩

স্বামী বিবেকানন্দের দুর্গাপূজা ☐ রবিব্রত ঘোষ ☐ ৩৫

মা দুর্গা যখন ভারতমাতা—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মহাশক্তির আরাধনা ☐ ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৩৭

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে যুগের বিবর্তন : কংগ্রেস বনাম বিজেপি শাসনকালের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ☐ সুমন সরকার ☐ ৪০

ব্রিকস্ সম্মেলন এবং ভারতের প্রভূত প্রাপ্তি ☐ ডঃ সুতনু সামন্ত ☐ ৪৩

সত্যকে লুকোতে মিথ্যা ন্যারেটিভের জাল বোনা ☐ ডঃ অরিন্দম ভট্টাচার্য ☐ ৪৬

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী—সরকারের কঠোর অবস্থান জরুরি ☐ ডঃ রানার চট্টরাজ ☐ ৪৭

গল্পকথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৮** ☐ **স্মরণে : ৪৯**

প্রকাশিত হবে
২ নভেম্বর
২০২৬

স্বস্তিকা

দীপাবলি সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
২ নভেম্বর
২০২৬

পূজাবকাশের জন্য স্বস্তিকা কার্যালয় ১৬ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই কারণেই স্বস্তিকার ১৯ ও ২৬ অক্টোবর, ২০২৬, সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হবে না। ২ নভেম্বর থেকে পুনরায় স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে। ২ নভেম্বর সংখ্যাটাই দীপাবলী সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে।

মূল্য একই থাকছে — ১৬ টাকা

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষে পদার্পণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালির দুর্গতি নাশ

মা আসিতেছেন। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তাহারই পূর্বাভাস। মায়ের আগমনের এই বার্তাটি যুগ যুগ ধরিয়া প্রকৃতিদেবীই জানাইয়া দিয়া থাকেন। মাকে বরণ করিবার জন্য প্রকৃতিদেবীই ডালি সাজাইয়া প্রস্তুত থাকেন। জলহারা মেঘ, শিউলি-শালুক-পদ্ম-কাশফুলে সাজিয়া তিনি নিজেই মা হইয়া উঠেন। প্রকৃতিদেবী ও জগজ্জননী মা অভিন্না হইয়া পড়েন। তাই চারিদিকে শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। আপামর বাঙ্গালির মনও আনন্দে ভরপুর। অবশ্য বহু বৎসর যাবৎ মহালয়ার প্রত্যুষে প্রকৃতিদেবীর সহিত মায়ের আগমন বার্তাটি জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া আসিতেছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতিআলেখ্য ও চণ্ডীপাঠ। ইহা এখন বাঙ্গালি সংস্কৃতির এক চিরন্তন ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া পড়িয়াছে। এই তিথি পরিবর্তনের ক্ষণেই পিতৃপক্ষের অবসান এবং দেবীপক্ষের সূচনা হইয়া থাকে। সমগ্র ভারতবাসীর সহিত বাঙ্গালিও পিতৃপক্ষের দিনগুলিতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মনে-প্রাণে শুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাহারই পরদিবস শারদীয়া নবরাত্রির প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত বাঙ্গালি দেবীর নয়টি রূপের আরাধনা করিয়া অশুভ শক্তির নাশ করিয়া শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকে। অবশ্য আড়ম্বরের আড়ালে বাঙ্গালি এখন জগজ্জননীর আরাধনার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে বাঙ্গালি দুর্গাপূজাকে আত্মশক্তি জাগরণের মাধ্যম হিসাবে দেখিয়াছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সরলাদেবী চৌধুরানী বাঙ্গালি জাতিকে বীরভাবে উদ্দীপিত করিবার জন্য দুর্গাপূজার অষ্টমীতিথিতে বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপনের প্রচলন করিয়াছিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের নিমিত্ত যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশের পরাধীনতা মোচনে আত্মশক্তি জাগরণের জন্য দুর্গাপূজার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। মান্দালয়ে কারাজীবনেও তিনি দুর্গাপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালির নিকট মা দুর্গাই দেশজননী রূপে প্রতিভাত ছিলেন। স্বাধীনতার পর বিশেষ করিয়া দীর্ঘ বিজাতীয় শাসনে ও তামসিক অপশাসনে বাঙ্গালি দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ঘোর দুর্যোগে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

তিন দশকেরও অধিককাল বিজাতীয় শাসনে বাঙ্গালিকে পূজা-পার্বণ, ধর্ম-কর্ম ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা চলিয়াছে। তৎসত্ত্বেও তাহারা বাঙ্গালির মন হইতে ধর্মভাব লুপ্ত করিতে পারে নাই। আশ্চর্যের বিষয় যে, কমিউনিস্টরা পূজা-পার্বণ, ধর্ম-কর্মের বিরোধিতা করিলেও নির্লজ্জের ন্যায় দুর্গাপূজার দিনগুলিতে মহাপূজার মণ্ডপে মণ্ডপে বিজাতীয় গ্রন্থের বিপণন কেন্দ্র খুলিয়া বসিয়া থাকে। ইহাদের ভাগ্য ভালো যে এতদিন বাঙ্গালি তাহা সহ্য করিয়াছে! দুর্গাপূজাকে সর্বাপেক্ষা বিকৃত করিয়াছে শিক্ষাদীক্ষাহীন, ভারতীয় সংস্কৃতিবোধহীন, জেহাদি-তস্করের দল। যাহারা পনেরো বৎসরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, সেই শাসনকালে তাহাদের নেত্রী তথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পিতৃপক্ষেই অর্থাৎ দেবীপক্ষের পূর্বেই দুর্গাপূজার উদ্বোধন করিয়াছেন। পিতৃপক্ষে যেখানে কোনো শুভকার্য শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ সেখানে দুর্গাপূজার ন্যায় এক মহাপূজার উদ্বোধন করা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মপরম্পরাকে আঘাত করারই নামান্তর মাত্র। পদে পদে তাহারা হিন্দু ধর্মসংস্কৃতিকে অপমান করিয়াছে। তাই ফলও তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালি তাহাদের পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। বাঙ্গালির সৌভাগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির বোধসম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, পিতৃপক্ষে কোনোমতেই দুর্গাপূজার উদ্বোধন করা চলিবে না। সম্পূর্ণ শাস্ত্রমতেই দুর্গাপূজা করিতে হইবে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, এই রাজ্যে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির অপমান অথবা সাধু-সন্ন্যাসীর কোনোরূপ অপমান সহ্য করা হইবে না। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বহু বৎসর পর দুর্গাপূজা পুনরায় শাস্ত্রমতে ও সাত্ত্বিক পরিবেশে সম্পন্ন হইবার পরিবেশ পাইয়াছে। বাঙ্গালি নবচেতনায় জাগ্রত হইয়াছে। জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গা বাঙ্গালির দুর্গতি নাশ করিয়াছেন।

সুভাষিতম্

শক্ত্যা বিহীনাঃ পুরুষাঃ হি লোকে নেতুং ন রাষ্ট্রং প্রভবন্তি নূনম্।
দেবা অপীমাং সমুপাস্য শক্তিং শুম্ভাদিদৈত্যান্ সমরে নিজঘ্নুঃ।।

অর্থঃ শক্তি বিনা কোনো পুরুষ নিজ রাষ্ট্ররক্ষায় সমর্থ হয় না। দেবতারাও শক্তির আরাধনা করেই শুম্ভাদি দৈত্যদের সংহার করেছিলেন।

ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবলে বিরোধীশূন্যতার ভাবনা মান্যতা পাবেই—

‘ভদ্রতা ও দুর্বলতা’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

এরাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কিছু মানুষ আর সংবাদমাধ্যম ‘গেল গেল’ রব তুলেছে। একটা আওয়াজ তোলার চেষ্টা হচ্ছে যে, বিরোধী শক্তিকে গায়ের জোরে ধ্বংস করে বিরোধীশূন্য রাজ্য তৈরির চেষ্টা চলছে। যারা কোনোদিন গণতন্ত্র মানেনি সেই তিন ভিনদেশী--- পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস, বিদেশি বামপন্থী আর জেহাদি-তোষণকারী তস্করদলের মুখে একথা মানায় না। প্রত্যেকের হাতেই অন্য বিরোধীর রক্ত লেগে রয়েছে। সাতের দশক থেকে বিদেশি বামেদের দাবি ছিল--- পাঁচ বছরের (১৯৭২-১৯৭৭) ভেতর তাদের ২২০০ কর্মীকে পাশ্চাত্যবাদীদের যুব ব্রিগেড হত্যা করেছে। দোষীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের হয়নি। ১৯৭৭-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে পাশ্চাত্যবাদীরা ভোকাট্টা হয়ে যায়। বিদেশি বামেরা ৩৪ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসে আর একবার (২০০৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে) ২৯৪-এর ভিতর ২৩৫টি আসন পায়। ৩৪ বছর ধরে লাল মাফিয়ারাজ আর সন্ত্রাসের বলি হন অসংখ্য নিরীহ মানুষ। তারা গেস্টাপো কায়দায় গুপ্ত বৈঠক ডাকত। বিরোধীদের ধানের গোলা, গোয়ালঘর, বাড়ি ও দোকানে আগুন লাগাত। পুকুরে ফলিডল ঢেলে মাছ মেরে দিত। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, রিগিং, জাল ও ছাপ্পা ভোট আর পুলিশ, ক্যাডার দিয়ে চট ভূতেরা ভোটের সময় গাজোয়ারি করত। ২০১১-তে রাজ্যবাসী তাদের প্রত্যাখ্যান করলে তারা চিরকালের জন্য পপাতধরণীতল হয়। উত্তরসূরী হিসাবে তস্কর দলকে রেখে যায়।

এই রাজ্যের রাজনীতিতে তখন জোরালোভাবে পা রাখছে ভারতীয় জনতা পার্টি। সংগঠনের ভিত তখন তাদের মজবুত হচ্ছে। ২০২১-এর ভোটের পর তস্করেরা দশ দিন ধরে এরাজ্যে নারকীয় তাণ্ডব চালায়। ভারতীয় জনতা পার্টির ৩৮৫ জন কর্মী ও সমর্থককে হত্যা করে এই ক্রিমিনাল গ্যাং। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে এরাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান ঘটে। ২০১৯-এ ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থানের পর থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির কয়েকশো কর্মী ও সমর্থক তস্করদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এ বছর তস্করদের সরিয়ে ভদ্র ও রুচিসম্মত দল হিসেবে ক্ষমতায় আসে ভারতীয় জনতা পার্টি। সে সুনাম ভাঙার চেষ্টা চলছে। তস্কর আর বিদেশিরা ভারতীয় জনতা পার্টির ভদ্রতাকে দুর্বলতা ধরে নিয়ে সব ধরনের নৈরাজ্য শুরু করেছে। এরাজ্যে সদ্য ক্ষমতায় আসা ‘ভারতীয় জনতা পার্টি’ দলের মধ্যে তারা তাদের উঞ্ছ ব্রিগেডকে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সে আবর্জনা সরানোর বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বের সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। এই আবর্জনা সরানোর লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে কোনো তস্কর আর বিদেশি দলের নেতা বা ক্যাডারদের দেখা যাক— এটা রাজ্যবাসীর কাছে কাম্য নয়। উঞ্ছজীবীদের লক্ষ্য হলো যেনতেনপ্রকারেণ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং রাজ্য সরকারের বদনাম করা। তবে তারা এটা বোঝেনি যে, ভদ্রতাকে দুর্বলতা হিসাবে ধরে নেওয়ার ফল ঠিক কতটা মারাত্মক হতে পারে। আপাতভাবে তা অযৌক্তিক মনে হলেও মনে রাখতে হবে যে, সাংগঠনিক কাঠামো ও ঐক্যনির্ভর রাজনৈতিক দল হলো— ভারতীয় জনতা পার্টি। ‘মতাদর্শ’ তার ভিত্তি। তাই বিদেশি আর জেহাদি-তস্করদের রপ্ত করা ব্যভিচার তারা কোনোদিনও করবে না। মহাভারতকার বলেছিলেন— পাপের ঘর বড়ো হলে ধর্মকে তার রূপ পাল্টাতে হয়। দু’ভাগ হয়ে জেহাদি-তস্কর দলের কোমর ভেঙে গিয়েছে। বিদেশিদের মতো সে ভাঙা কোমর আর জুড়বে না। ২০১৬, ২০২১, ২০২৬-এর তিনটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর বিদেশিদের নাম হয়েছে ‘জব্দ পার্টি’। প্রতিটি নির্বাচনে তাদের ৯৪-৯৮ শতাংশ প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়।

তবে ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনে দেশবিরোধী শক্তির মৃত্যু হতে বাধ্য। এরাজ্য থেকে পাশ্চাত্যবাদী আর বিদেশিদের সরাতে ৬০ বছর সময় লেগেছিল। সে তুলনায় ২০২১ সালে এরাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি লাভের মাত্র পাঁচ বছরের ভিতর ক্ষমতা থেকে জেহাদি-তস্করদের অপসারিত করে ভারতীয় জনতা পার্টি। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো শত্রু আর অভিশাপ হলো— কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অর্বাচীন বিরোধী। তাই অস্থিরতার মধ্যে চৌত্রিশ থেকে পনেরো বছর শাসন করেছে আগের শাসকরা। আনুষ্ঠানিক বিরোধী হয়ে উঠে পাঁচ বছরের ভিতর ভারতীয় জনতা পার্টি এরাজ্যে যেভাবে ক্ষমতাসীন হয়, তাতে মানতেই হবে যে অন্য বিরোধীদের চেয়ে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান অনেকটাই বেশি। ফলে শাসক হিসেবেও তাদের শাসন ক্ষমতার দক্ষতা পূর্ববর্তী শাসকদের থেকে অনেক গুণ বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভারতের সবচেয়ে নবীন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। তাদের চিন্তাভাবনা মান্ধাতা আমলের রাজনৈতিক ভাবনার চেয়ে এগিয়ে থাকবেই। স্থানীয় তস্করদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির তুলনা প্রজাপতির সঙ্গে গুবরে পোকার তুলনার সমান। ক্ষয়িষ্ণু বাম আর ভেঙে যাওয়া জেহাদি-তস্কর গোষ্ঠী শাসক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের যা ক্ষতি করেছে— তাতে বোঝা যায় যে, বিরোধী হিসাবে তারা এরাজ্যের আরও বেশি ক্ষতি করবে। ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসাবে অচিরেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে। ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গতিরোধের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ইন্ডিজোটের ব্যানারে পাশ্চাত্যবাদী, বিদেশি ও জেহাদি-তস্করের দল একজোট হয়েছে। ভদ্রতা কোনো মুখোশ নয়। তার সে সততা রয়েছে। নতুন সরকারের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবলে বিরোধীদের মস্ত বড়ো ভুলের খেসারত দিতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদি গো!
সেরা অভিনেত্রী পুরস্কার হাতছাড়া

সময়খারাপেষু দিদি,

সময় খারাপ আর কাকে বলে! ক্ষমতা নেই, দল নেই, প্রতীক নেই, এবার সেরা অভিনেত্রী পুরস্কারটাও হাতছাড়া। না, সে পুরস্কার আপনি দিদি, পাঁচ বছর ভোগ করেছেন। ভাঙা পায়ের অভিনয় একটা ভোট জিতিয়েছে কিন্তু ভুল করে ড্রয়ারে এক্সরে রিপোর্টটা ফেলে এলেন! এটা কেউ করে! আসলে আপনি তো ভেবেছিলেন, আরও অনেক দিন ক্ষমতায় থাকবেন। তাই সেফটিপিন, হজমিগুলির শিশি, নেমন্তন্নর চিঠি-সহ অনেক কিছুর সঙ্গে মিথ্যা পা ভাঙার সত্য রিপোর্টটা রেখে চলে এসেছিলেন। আর শুভেন্দু অধিকারী আপনার চেয়ারে বসে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলতেই গুপ্তধন পেয়ে গেছেন। এটাকে সময় খারাপ ছাড়া আর কিছু বলার নেই।

এর মধ্যে আবার আপনার প্রিয় ভাইদের প্রেমে নজরদারির ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, প্রেমের নামে প্রতারণা হলে আইন কি নীরব থাকবে? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 'লাভ জেহাদ' এবং ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, তাঁর সরকার সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করবে। এ ঘোষণায় রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা খুশি হলেও সেকু, মাকু, পাকু, নেকুরা নানা প্রশ্ন তুলবে। আপনিও তুলুন। ফেসবুক লাইভে বলুন, প্রেম করেছে বেশ করেছে। সরকারি নজরদারি মানছি না, মানব না।

আগেই সরকার বলেছে, বিয়ে না করে সহবাস বা লিভ-ইন করলে তারও আইনি বাধ্যবাধকতা থাকবে। তাতে প্রেমের গোপনীয়তা ফাঁস হবে বলে চিৎকার চলছে। এবার প্রেমের ফাঁদ পেতে হিন্দু মেয়েদের সর্বনাশের বিরুদ্ধে আইন নিয়ে তো আরও কথা হবে। তার আগে প্রস্তুত হতে হবে আপনাকেও।

আমার বক্তব্যের মূল কথা দিদি খুব পরিষ্কার। যদি কোনো সম্পর্ক সত্যিকারের প্রেমের সম্পর্ক হয়, দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সম্পর্ক স্বেচ্ছায় তৈরি হয়, সেখানে সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি প্রেমের নামে প্রতারণা, পরিচয় গোপন, জোরজবরদস্তি, ভয় দেখানো অথবা প্রতারণামূলক ধর্মান্তর ঘটে, তাহলে সেই অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকা উচিত। একই ভাবে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় মিথ্যা পরিচয় দিয়ে জমি কিনে যেভাবে জামাতিদের সাহায্য করার ছক আপনার জমানায় শুরু হয়েছে তা বন্ধ করতে হবে।

আইনের লক্ষ্য অপরাধ দমন, কোনো সম্প্রদায়কে আঘাত নয়। কিন্তু লাভ জেহাদের কথা বললেই 'মুসলমান বিপদে রয়েছে' বলা হবে! কেনো প্রশ্ন নয় বলা হবে? না বলতে দিলে, বলা হবে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে।

লাভ জেহাদের মতো ল্যান্ড জেহাদও রাজ্য ও দেশের স্বার্থে বন্ধ করা দরকার। আপনার ভক্ত হয়েও এটা আমার মত।

উত্তরপ্রদেশে 'লাভ জেহাদ' নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021, যা ২০২৪ সালে আরও কঠোর করা হয়েছে। আইনের লক্ষ্য হলো প্রতারণা, জোর, ভয় দেখানো, প্রলোভন, undue influence বা অন্য কোনো fraudulent means ব্যবহার করে ধর্মান্তর ঠেকানো। বিয়ের মাধ্যমে বা বিয়ের অজুহাতে বেআইনি ধর্মান্তর ঘটানো হলে আইন প্রযোজ্য হতে পারে। সাধারণ বেআইনি ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।

গুরুতর ক্ষেত্রে মানে কাউকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তার জীবন বা সম্পত্তির প্রতি ভয় দেখানো, জোরপ্রয়োগ অথবা বিয়ে/বিয়ের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ধর্মান্তর করানোর মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। আবার নাবালিকা, মহিলা বা এসসি/এসটি হলে বেআইনি ভাবে ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে শাস্তি আরও কঠোর করা হয়েছে।

মানবপাচার বা নাবালককে বেআইনি ধর্মান্তরের সঙ্গে যুক্ত করার গুরুতর ক্ষেত্রেও ২০ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে। এখানেই শেষ নয় দিদি। যদি কোনো বিয়ে শুধুমাত্র বেআইনি ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে Section 6 অনুযায়ী বিয়ে আদালতের মাধ্যমে void ঘোষণা করার বিধান রয়েছে।

আইনের লক্ষ্য অপরাধ দমন, কোনো সম্প্রদায়কে আঘাত নয়। কিন্তু লাভ জেহাদের কথা বললেই 'মুসলমান বিপদে রয়েছে' বলা হবে! কেনো প্রশ্ন নয় বলা হবে? না বলতে দিলে, বলা হবে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। এটা আমার সোজা কথা।

ছাড়বেন না দিদি। একদম ছাড়বেন না। মুসলমান প্রেম জিন্দাবাদ। □

অতিথি কলম



দত্তাত্রেয় হোসবলে

অশোক সিঙ্ঘলজী এক কর্মযোগী



ভারতের জন্য এটি যুগ-নির্মাণের বেলা। সম্পূর্ণ দেশ এক নতুন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 'নতুন ভারত' নির্মাণের সংকল্প নিচ্ছে। ভারত আত্মগ্লানি থেকে বেরিয়ে আত্মগৌরবের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার স্ব-বোধ জাগ্রত হচ্ছে। এই পরিবর্তনকে ভারতের পুনরুত্থান বলা যেতে পারে।

যে সকল মহাপুরুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতের স্ব-বোধ জাগ্রত হয়েছে এবং হিন্দু সমাজে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হয়েছে, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় অশোক সিঙ্ঘলজীর নাম প্রথম সারিতে আসে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমাজ তাঁকে অনেক বিশেষণে ভূষিত করেছে— কেউ তাঁকে 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' বলেছেন, কেউ তাঁকে বলেছেন শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলনের পুরোধা, কেউ হিন্দু পুনরুত্থানের নায়ক, তো কেউ রাষ্ট্র জাগরণ অভিযানের সেনাপতি।

কিন্তু যদি অশোকজীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় কেবল একটি শব্দে দিতে হয়, তবে সেই শব্দটি হলো— 'কর্মযোগী'।

তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম করতেন। কোনো কাজে সফলতা পেলে তার কৃতিত্ব নিজে না নিয়ে ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দিতেন এবং সফলতা থেকে প্রাপ্ত খ্যাতি থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতেন। খ্যাতির শিখরে পৌঁছেও তিনি কখনও খ্যাতির অহংকার রাখেননি। তাঁর উপস্থিতিতে যদি তাঁর প্রশংসা হতো, তবে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। মান-অপমান, যশ-অপযশের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের কর্তব্য পথে সমভাবে চলতে থাকাই এক কর্মযোগী এবং সত্যিকারের স্বয়ংসেবকের পরিচয় এবং এই গুণ অশোকজীর জীবনে স্পষ্টভাবে দেখা যেত।

রাষ্ট্রকার্যে নিজ প্রতিভা সমর্পণ : অশোকজী দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর মেধা ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির জন্য নয়, বরং রাষ্ট্রের উত্থানের জন্য সমর্পিত ছিল।

তিনি এক প্রতিষ্ঠিত, প্রবুদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এক ভাই ভারতীয় পুলিশ সেবায় কর্মরত ছিলেন এবং উত্তরপ্রদেশের পুলিশ মহানির্দেশক পদ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, তাঁর আর এক ভাই সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হন। স্বয়ং অশোকজী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধাতু বিজ্ঞানে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। তাঁর সামনে ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতির অনেক সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি নিজের জীবন রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেন।

তিনি মূলত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও নিজের জন্য কিছু পাওয়ার পরিবর্তে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সাধনার কেন্দ্র নিজে নয়; তাঁর সাধনার কেন্দ্র ছিল— সমাজ ও রাষ্ট্র।

সঙ্ঘ সংস্কার থেকে নির্মিত ব্যক্তিত্ব : অশোকজী ছাত্রজীবনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি পূজনীয় প্রফেসর রাজেন্দ্র সিংহ 'রজ্জু ভাইয়া'র পথনির্দেশ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। মাননীয় ভাউরাও দেওরস এক দক্ষ শিল্পীর মতো তাঁর ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলেন। তিনি পূজনীয় শ্রীগুরুজীর পথনির্দেশও নিরন্তর পেয়েছেন।

তাঁর সমর্পণ, কর্মঠতা, দৃঢ় সংকল্প, পরিচালন-দক্ষতা, সংগঠন-কুশলতা ও দূরদর্শিতায় এই মহাপুরুষদের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যেত। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সম্পূর্ণ করেই তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে যান। তাঁকে যে দায়িত্বই দেওয়া হতো, তিনি তা পূর্ণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে পালন করতেন। মনে হতো যেন তিনি সেই দায়িত্বের জন্যই তৈরি।

বিরাট হিন্দু সম্মেলন ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব : যখন তিনি দিল্লি প্রান্ত (যার মধ্যে দিল্লি ও হরিয়ানা পড়ত)-এর প্রান্ত প্রচারক ছিলেন, তখন মীনাক্ষীপুরমের ধর্মান্তরণের ঘটনা সমগ্র সমাজকে উদ্বিগ্ন করেছিল। হিন্দু সমাজের ব্যাপক জাগরণের প্রয়োজনীয়তা দেশজুড়ে অনুভূত হচ্ছিল।

মাননীয় অশোকজীকে দিল্লিতে বিরাট হিন্দু সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ডঃ করণ সিংহ-সহ অসংখ্য বিশিষ্টজন ও সমাজের বিভিন্ন বর্গকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই বিরাট হিন্দু সম্মেলনের পরিকল্পনাকে সার্থক করেন। পূজনীয় সন্তদের পথনির্দেশে দর্শনে সমাজের বিভিন্ন বর্গকে সংযুক্ত করে যে দক্ষতার সঙ্গে এত বিশাল কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছিল, তা থেকে অশোকজীর সংগঠন-ক্ষমতার পরিচয় সমগ্র সমাজ পায়।

এই আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে ধর্মান্তরণের চ্যালেঞ্জের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। এর পর ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক জাগরণের জন্য তাঁকে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তিনি এই দায়িত্বও সেই আন্তরিকতা ও সমর্পণের সঙ্গে পালন করেন। সমাজের

পরিস্থিতি বোঝা, তার অনুযায়ী চিন্তা করা, পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা বাস্তবে রূপ দেওয়া— এটাই ছিল তাঁর কার্যশৈলীর বিশেষত্ব।

সমরস হিন্দু সমাজ নির্মাণের প্রয়াস : হিন্দু সমাজের সামনে শতাব্দী ধরে অস্পৃশ্যতা একটি গুরুতর সামাজিক চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। অস্পৃশ্যতা শেষ না হলে সমরস সমাজের কল্পনা পূর্ণ হতে পারে না।

অশোকজী এই বিষয়টিকে কেবল সম্মিলিত ভোজ বা প্রতীকী কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি পূজনীয় সন্তদের কাছে হিন্দু সমাজকে এই বার্তা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন যে, অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শের অনুকূল নয়। তপশিলি সমাজের বস্তিতে সন্তদের যাতায়াত শুরু হয়। এই বিষয়ে অধ্যয়ন ও বিমর্শ প্রসারের প্রয়াসও অব্যাহত থাকে।

৯ নভেম্বর ১৯৮৯-এ অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস কার্যক্রমে তপশিলি সমাজের শ্রী কামেশ্বর চৌপালের ভূমিকা এই ব্যাপক সামাজিক সমরসতার বার্তার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। সেই কার্যক্রমে অনেক পূজনীয় সন্ত ও ধর্মাচার্য উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে বারাণসীতে ডোম রাজার বাড়িতে পূজনীয় সন্তদের ভোজন করাও সামাজিক সমরসতার বার্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে ওঠে।

এই প্রচেষ্টাগুলি সমাজে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে অবদান রেখেছে যে সামাজিক ভেদাভেদ দূর করে সমরস হিন্দু সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব।

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলন ও অশোকজী : শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলন আধুনিক ভারতের সবচেয়ে ব্যাপক সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি ছিল। ১৯৮০-র দশক থেকে ২০১৯-এর সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তারপর শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ পর্যন্ত এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছিল।

রাম-জানকী রথযাত্রা, শিলা-পূজন, চরণ-পাদুকা পূজন, রামজ্যোতির মতো অনেক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক জনজাগরণ হয়।

এই পুরো আন্দোলনে অশোকজীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৯০-এর করসেবার সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং অনেক কার্যকর্তার বলিদান আন্দোলনকে একটি নির্ণায়ক মোড় দেয়। কঠিন পরিস্থিতিতেও অশোকজীর দৃঢ় বিশ্বাস কার্যকর্তাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল— 'এটি রামজীর কাজ, রামজী-ই এই কাজ অবশ্যই পূর্ণ করবেন।'

তাঁর জীবদ্দশায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু যে আন্দোলনকে তিনি দশকের পর দশক দিশা, সংগঠন ও শক্তি দিয়েছিলেন— তাঁর প্রয়াণের পর তার ফললাভ হয়। ৯ নভেম্বর ২০১৯-এ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয় এবং ২০২০-র ৫ আগস্ট ভূমিপূজন হয়ে ২২ জানুয়ারি, ২০২৪-এ শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরে শ্রীরামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং আজ সেখানে ভব্য মন্দির নির্মিত হয়েছে।

কেবল রামজন্মভূমি পর্যন্ত সীমিত নয় : অশোকজীর পরিচয় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসেবে তৈরি হলেও, তাঁর কার্যক্ষেত্র এর থেকে অনেক ব্যাপক ছিল।

রামসেতু রক্ষা, অমরনাথ যাত্রা, গো-অনুসন্ধান ও গোবংশ সংবর্ধন, সামাজিক সমরসতা, প্রবুদ্ধ বর্গকে হিন্দু চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জনজাগরণ— এইরকম অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ ও পথনির্দেশ উল্লেখযোগ্য ছিল।

তিনি ধাতুবিদ্যার (Matallurgy) বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু সমাজের প্রকৃতি, তার ক্ষমতা ও তার চ্যালেঞ্জগুলি উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিও অত্যন্ত গভীর ছিল। তাঁর কার্যশৈলীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, সংগঠন-দক্ষতা, আধ্যাত্মিক আস্থা ও রাষ্ট্রভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যেত।

যুগদ্রষ্টা কর্মযোগী : অশোকজীর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব ছিল যে, নির্দিষ্ট কোনো উপলব্ধিতেই তিনি থেমে থাকতেন না। একটি লক্ষ্য প্রাপ্ত হলেই তিনি পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতেন। তিনি সমাজের সামনে উপস্থিত প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করতেন এবং তার সমাধানের জন্য সমাজকে সংগঠিত করতে লেগে যেতেন। তাঁর কাছে সংগঠন ছিল সাধন, সমাজ ছিল সাধ্য এবং রাষ্ট্রসেবা ছিল জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সম্ভাবনাগুলিকে ত্যাগ করে রাষ্ট্রকার্যকে সর্বোপরি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি খ্যাতি পেয়েছেন, কিন্তু খ্যাতি থেকে নিজেকে আলাদা রেখেছেন। তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু কৃতিত্ব নিজে নেওয়ার আশা রাখেননি। তিনি সংঘর্ষ করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়।

এই কারণেই অশোক সিঙ্ঘলজীর জীবন কেবল এক ব্যক্তির জীবন নয়, বরং সমর্পণ, সাধনা, সংগঠন ও কর্মযোগের এক প্রেরণাদায়ী অধ্যায়।

ভারতের বর্তমান পুনরুত্থানে যে সকল মহাপুরুষের তপস্যা, ত্যাগ ও পুরুষার্থের অবদান রয়েছে, অশোকজী তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। হিন্দু সমাজে আত্মবিশ্বাস জাগাতে, সামাজিক সমরসতার প্রচার ও প্রসারে এবং রাষ্ট্রচেতনাকে দৃঢ় করতে তিনি নিজের সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

তাই তাঁকে কেবল শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলনের মহানায়ক হিসেবে দেখা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বকে সীমিত করা হবে।

তিনি প্রকৃতপক্ষে এক কর্মযোগী ছিলেন— এমন এক কর্মযোগী, যাঁর জীবন আগামী প্রজন্মকে নিরন্তর প্রেরণা দিতে থাকবে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পূজাবকাশের জন্য স্বস্তিকা কার্যালয় ১৬ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই কারণেই স্বস্তিকার ১৯ ও ২৬ অক্টোবর, ২০২৬, সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হবে না। ২ নভেম্বর থেকে পুনরায় স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে।

— স্বঃ সঃ

শোকসংবাদ



পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি খণ্ডের ছাতাটাঁড় শাখার স্বয়ংসেবক শঙ্কর কুমার গত ২০ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও পুত্র, কন্যাকে রেখেছেন।

‘দুর্গাপূজা’র বিষয়ে মিথ্যে ন্যারেটিভ ফেরি করার পিছনে বাজারি সংবাদমাধ্যমের কায়েমি স্বার্থ রয়েছে

একটি বাজারি পত্রিকা গোষ্ঠী বাগেশ্বর ধাম সরকার ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীকে আখ্যা দিয়েছে— ‘বহিরাগত বাবা’। সম্প্রতি হাওড়ায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তরুণ সন্ন্যাসী বাগেশ্বর ধাম সরকার তাঁর বক্তব্যে সাত্ত্বিক দুর্গাপূজার বিষয়টি উল্লেখ করেন। গণতান্ত্রিক দেশে সকলের নিজস্ব মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। বঙ্গভূমি বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত— সকল মতাবলম্বীরই ভূমি। কারও কোনো মত পছন্দ না হলে তা গ্রহণ না করার স্বাধীনতা সকলের রয়েছে। কিন্তু মিথ্যে ন্যারেটিভের জাল বুনে সনাতনকে আক্রমণ কেন? প্রাচীন তান্ত্রিক ও লৌকিক আচার ও পঞ্চ‘ম’কার সাধনায় দেবীকে আমিষ ভোগ নিবেদনের বিধান রয়েছে, যা শক্তি ও উৎসবমুখরতার প্রতীক। অনেক পারিবারিক পূজায় বিশেষভাবে ব্যক্তিগত আচারে আমিষ ভোগ নিবেদনের প্রাচীন নিয়ম মেনে পূজা করা হতো, যদিও সেই সব শাক্ত বিধির পূজা আজ প্রায় নগণ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগে চণ্ডী-চামুণ্ডা রূপে দেবীর পূজায় ডাকাতরা নরবলি দিত। তারা প্রার্থনা করত যাতে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কার্য সফল করেন। এর পরের যুগে জমিদারেরা ব্যক্তিগত শক্তি, ক্ষমতা, আধিপত্য বজায় রাখার নিরিখে শাক্ত বিধিমতে মোষ, পাঁঠা বলিপ্রথার প্রচলন শুরু করেন। বঙ্গভূমির বিভিন্ন প্রান্তে শক্তিসাধক তান্ত্রিকরা আজও লুকিয়ে নরবলি দিয়ে চলেছে। সবই ব্যক্তিগত চাহিদা ও কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে এগুলি কোনোদিনই সর্বজনীন ছিল না। আজ যখন সামাজিকভাবে বলিপ্রথা সম্পূর্ণ নির্মূলের দিকে, তখন হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই শাক্ত বিধির চর্চার উদ্ভব হয়েছে— শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উল্লাসের জন্য, ভক্তি-শ্রদ্ধার জন্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই।

বারোয়ারি পূজা কখনও তান্ত্রিক মতে হয় না, সাত্ত্বিক মতেই হয়ে থাকে, যেহেতু এই পূজা ‘সর্বজনীন’ আকার ও চরিত্র পরিগ্রহ করেছে। সামাজিক নিয়মানুযায়ী পূজা হয়ে থাকে। তাই ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুজোআর্চার রীতিনীতির মধ্যে কোনোভাবেই আনা চলবে না। সনাতন নিয়মানুযায়ী যা যা প্রযোজ্য, দুর্গাপূজার ক্ষেত্রে তাই হওয়া আবশ্যক। যারা সর্বজনীন দুর্গাপূজার সঙ্গে যুক্ত, তারা সকলেই কি সনাতন ধর্ম চর্চার মধ্যে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন? তারা সকলেই কি শ্রীশ্রীচণ্ডী পূজার মন্ত্রপাঠে পারদর্শী? সারা বছর নিষ্ঠার সঙ্গে সবরকম পূজা বা সাধনায় মগ্ন থাকেন? কতগুলো দুর্গামন্দির আজ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে? তাহলে কি মহিষাসুরমর্দিনীর প্রকৃত রূপ ও উপাসনা আজ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে এতো বিপদগ্রস্ত হতো? বারোয়ারি পূজা ‘সর্বজনীন উৎসব’-এর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, কিন্তু তা বলে পূজার সঙ্গে আর বোঝাপড়া সম্ভব নয়। উজ্জয়িনীতে কালভৈরব হলেন মহাদেব শিবের উগ্র রূপ। প্রাচীন কাল থেকে তাঁকে শান্ত ও তুষ্ট করার জন্য আজও সুরা উৎসর্গ করা হয়। তাহলে কি বিশ্বের সব শিবলিঙ্গেই সুরা উৎসর্গ করার অনুমতি দিতে হবে?

নিজস্ব মতপ্রকাশের পর একটি বাজারি পত্রিকা ও সেই সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত একটি বাংলা টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল বাগেশ্বর ধাম সরকার ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীকে ‘বহিরাগত বাবা’ আখ্যা দিয়েছে। আচ্ছা এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্যে জেহাদি-তস্করদের দল জিতে গেলে ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার, বসিরহাট, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুরের সব জায়গায় দুর্গাপূজা হতো? এই বাজারি পত্রিকাগোষ্ঠী জানে যে, জ্যোতি বসুর আমল থেকে এরাজ্যের বহু জায়গায় স্কুলে ফতোয়া জারি করে সরস্বতী পূজা বন্ধ। তৃণমূলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই সন্ত্রাস বহুগুণ বেড়েছে। এই বাজারি পত্রিকাগোষ্ঠী জানে যে, যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা বন্ধ, কিন্তু ইফতার পার্টি হয়। এই ধরনের পত্রিকা বা টিভি নিউজ চ্যানেল নন্দন-বাংলা অ্যাকাডেমি চত্বরে প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ উৎসব নিয়ে কোনোদিন প্রতিবাদ করেছে? এই সংবাদমাধ্যমগোষ্ঠী কিন্তু জানে যে, মুসলমান মেয়েদের উপর গত বছর পর্যন্ত হিজাব ও বোরখা পরে স্কুল-কলেজে যাওয়ার ফতোয়া দেওয়া ছিল উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসাগুলির পক্ষ থেকে। তারা জানে যে, ‘পশ্চিমবঙ্গ’ বাল্যবিবাহে গোটা দেশে এক নম্বর রাজ্য, কারণ জম্মু-কাশ্মীরের পর এই রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা সর্বোচ্চ।

বাঙ্গালির দুর্গাপূজার সময় সারা ভারতে ‘নবরাত্রি’ উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। কেউ নিরামিষ খেয়ে, কেউ উপবাসে থেকে দেবীর পূজা করেন। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় যেখানে স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের বসতি গড়ে ওঠে, সেখানে যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল, ঢাকার লোক— প্রত্যেকের পৃথক নিয়ম ছিল। ঝাড়গ্রাম ও হাওড়ার নিয়ম আবার আলাদা। পূজার্চনার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকনের নিয়ম আলাদা। আর সেই জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন— ‘যত মত তত পথ’। যা মানতে চাইছে না এই বাজারি সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী। এই বাজারি সংবাদমাধ্যমগোষ্ঠী আগে ‘ভারতীয়’ হওয়ার চেষ্টা করুক। বাঙ্গালিকে কখনও আমেরিকান, কখনও রাশিয়ান, কখনও চীনা, কখনও বাংলাদেশি বানানোর চেষ্টা করে আজ তাদের প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিক্রি প্রায় তলানিতে। কর্মী ছাঁটাইতে সবার আগে তারা। এবার তারা ‘বিলুপ্ত’ হওয়ার অপেক্ষা করছে। মুসলমানরা বাংলাদেশ থেকে ফতোয়া জারি করতে পারে, কিন্তু এই বাজারি সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠীর কাছে তারা বহিরাগত নয়। ভারতের স্বাধীনতার এত বছর পরও তারা নিজেদের কট্টর হিন্দু-বিরোধিতা বন্ধ করল না। সমস্ত রকম বিদেশি এজেন্ট, ধ্বংসাত্মক বাম-অতিবাম, জেহাদি, তস্কর রাজনৈতিক শক্তিকে লুকিয়ে রাখছে তারা। আর স্বাধীন মতপ্রকাশের কারণে বাগেশ্বর ধাম সরকার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহারাজ ‘বহিরাগত’? □

বাঙ্গালির দুর্গাপূজা : ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা, শিল্প ও ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার এক জীবন্ত মহোৎসব

ডঃ সমীর চন্দ্র দাস

ভূমিকা

'এসেছে শরৎ—হিমের পরশ লাগে প্রাণে'— বঙ্গের প্রকৃতি যখন কাশফুলের শুভ্রতায়, শিউলির গন্ধে, নীল আকাশের মেঘের ভেলায় এবং ভোরের শিশিরে নতুন করে সেজে ওঠে, তখন বাঙ্গালির হৃদয়ে জেগে ওঠে এক অনির্বচনীয় আনন্দ— দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা বাঙ্গালির কাছে শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনা, পারিবারিক আবেগ, লোকসংস্কৃতি, শিল্পচর্চা, সঙ্গীত, সাহিত্য, স্থাপত্য, অর্থনীতি, সামাজিক মিলন এবং মানবিকতার এক বৃহৎ সম্মেলন। মৃৎশিল্পীর হাতে গঙ্গার পলিমাটি থেকে তৈরি প্রতিমা, ঢাকের বাদ্য, ধুনুচির ধোঁয়া, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, অঞ্জলি, ভোগ, সিঁদুরখেলা, বিসর্জনের বিষাদ— সব মিলিয়ে দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছে বাঙ্গালি জীবনের এক সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। ২০২১ সালে 'Durga Puja in Kolkata' ইউনেস্কোর Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-তে অন্তর্ভুক্ত হয়। UNESCO-এর বিবরণে দুর্গাপূজাকে ধর্ম ও শিল্পের এক অসাধারণ সম্মেলন এবং শিল্পী ও নকশাবিদদের সহযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে উৎসব একসময় রাজবাড়ি ও জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে সীমাবদ্ধ ছিল, সময়ে প্রবাহে তা হয়ে উঠেছে সমাজের সর্বস্তরে মানুষের অংশগ্রহণে নির্মিত একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

১. দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক ভিত্তি

ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'শক্তি' ধারণাটি অত্যন্ত প্রাচীন। দেবী কেবল কোনো নির্দিষ্ট দেবতার স্ত্রী-রূপ নন; তিনি সৃষ্টির, স্থিতির ও পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতীক। দুর্গা শব্দের একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো— যিনি দুর্গমতা থেকে রক্ষা করেন, যিনি বিপদ অতিক্রমের শক্তি প্রদান করেন। মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেবী দুর্গা অশুভের বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয়ের প্রতীক। পুরাণকাহিনিতে মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ তাই কেবল পৌরাণিক যুদ্ধ নয়— এটি মানুষের অন্তর্গত অজ্ঞতা, অহংকার, হিংসা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জ্ঞান, সংযম, ন্যায় ও শক্তির প্রতীকী সংগ্রাম হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। এই কারণেই দুর্গাপূজার মূল তাৎপর্যকে শুধু 'অসুরবধ' হিসেবে দেখলে এর গভীর সাংস্কৃতিক অর্থ সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। দেবীর দশ হাতে যে দশ অস্ত্র, সেগুলিকে ভারতীয় প্রতীকচিন্তার আলোকে মানুষের বহুমাত্রিক শক্তি ও কর্তব্যের রূপক হিসেবেও দেখা যায়।

২. বাঙ্গালির ঘরে 'মা' হয়ে দুর্গার আগমন

বঙ্গের দুর্গাপূজার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো— দেবী দুর্গা এখানে দূরের কোনো অলৌকিক শক্তি নন; তিনি বাঙ্গালির ঘরের মেয়ে 'উমা'। শারদীয়া দুর্গাপূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পিতৃগৃহে কন্যার ফিরে আসার আবেগ। মহালয়ার পর থেকেই যেন বঙ্গের ঘরে ঘরে অপেক্ষা শুরু হয়— 'মা আসছেন।' এই 'মা' ধারণাটি বঙ্গের সামাজিক ও পারিবারিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আগমনী গানগুলিতে মেনকার কণ্ঠে উমার জন্য যে আকুলতা প্রকাশ পায়, সেখানে দেবী ও মানুষের সম্পর্ক একেবারে পারিবারিক। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিবরণেও উল্লেখ আছে যে, বঙ্গে উমার পিতৃগৃহে আগমনকে কেন্দ্র করে আগমনী সঙ্গীতের একটি বিশেষ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। ফলে বাঙ্গালির দুর্গাপূজা একদিকে মহাশক্তির আরাধনা, অন্যদিকে মেয়ের বাড়ি ফেরার আনন্দ।

৩. রাজবাড়ি থেকে বারোয়ারি—দুর্গাপূজার সামাজিক বিবর্তন

দুর্গাপূজার বর্তমান সর্বজনীন রূপ একদিনে তৈরি হয়নি। বঙ্গের বিভিন্ন রাজপরিবার, জমিদার পরিবার ও বনেদি বাড়িতে দুর্গাপূজার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমবেতভাবে পূজা করার সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। বেলুড় মঠের ঐতিহাসিক বিবরণে প্রচলিত মত হিসেবে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁর সঙ্গে আনুমানিক সপ্তদশ শতকের শুরুতে বৃহৎ আকারে দুর্গাপূজার প্রচলনের একটি ধারা যুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'বারোয়ারি' ও 'সর্বজনীন' পূজার প্রসার দুর্গাপূজাকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পরিসর থেকে আরও বিস্তৃত সামাজিক পরিসরে নিয়ে যায়। এই পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দুর্গাপূজা ধীরে ধীরে 'আমার বাড়ির পূজা' থেকে 'আমাদের পাড়ার পূজা' এবং শেষপর্যন্ত 'সবার উৎসব'-এ পরিণত হয়েছে। আজকের প্যান্ডেল-সংস্কৃতি, পূজা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সম্মিলিত ভোগ এবং সামাজিক উদ্যোগ এই দীর্ঘ বিবর্তনেরই ফল।

৪. বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা : ইতিহাসের জীবন্ত দলিল

কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক অনন্য দলিল। রাজবাড়ির ঠাকুরদালান, উঁচু স্তম্ভ, খিলান, পুরনো স্থাপত্য, পারিবারিক প্রতিমা, নির্দিষ্ট আচার এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসা রীতিনীতি— সব মিলিয়ে এগুলি কেবল পূজাস্থল নয়, ইতিহাসের জীবন্ত সংগ্রহশালা। এখানে অনেক সময় আধুনিক থিম-প্যান্ডেলের পরিবর্তে দেখা যায়—

সাবেকি একাচালা প্রতিমা, ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজ, নির্দিষ্ট

পারিবারিক রীতি, পুরনো বাদ্যপ্রথা, প্রজন্মান্তরে চলে আসা পুরোহিত ও শিল্পী-সম্পর্ক, পারিবারিক ভোগের বিশেষ পদ এবং ঠাকুরদালানকে কেন্দ্র করে সামাজিক সমাবেশ। এই পূজাগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঐতিহ্য মানে শুধু পুরনো জিনিস সংরক্ষণ নয়; ঐতিহ্য হলো জীবনের মধ্যে কোনো সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে সক্রিয় রাখা।

৫. কুমোরটুলি : মাটি থেকে মহাশক্তির রূপ

দুর্গাপূজার সঙ্গে কলকাতার কুমোরটুলি নামটি অবিচ্ছেদ্য। গঙ্গার তীরবর্তী পলিমাটি, খড়, বাঁশ, সুতো, কাপড়, রং অলংকার এবং শিল্পীর দক্ষ হাত— এই সামান্য উপকরণ থেকেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় দেবীমূর্তি। UNESCO-এর বিবরণ অনুসারে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিতে শিল্পীরা গঙ্গা থেকে সংগৃহীত কাঁচা মাটি দিয়ে দুর্গা ও তাঁর পরিবারের মূর্তি নির্মাণ করেন, মহালয়ার সময় দেবীর চক্ষুদানের মধ্য দিয়ে প্রতিমায় দেবত্বের প্রতীকী আহ্বান ঘটে। UNESCO Intangible Cultural Heritage — এখানে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ্য করা যায়— প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। মাটি কেবল নির্মাণসামগ্রী নয়; মাটি হচ্ছে পৃথিবীর প্রতীক। সেই মাটি দিয়ে দেবী নির্মিত হন, পূজিত হন এবং শেষপর্যন্ত আবার জল-মাটির কাছেই ফিরে যান। এই চক্রটি যেন বলে—

প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি মানুষের সাধনা দেবত্বের আরাধনা প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন।

৬. মহালয়া থেকে বিসর্জন—একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক যাত্রা

দুর্গাপূজা কয়েক দিনের অনুষ্ঠান হলেও এর সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি অনেক আগে শুরু হয়।

মহালয়া : মহালয়া যেন বাঙ্গালির শারদোৎসবের আনুষ্ঠানিক সুচনা। ভোরের অন্ধকারে স্তোত্র, চণ্ডীপাঠ, সঙ্গীত ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর বহু প্রজন্মের বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক স্মৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। **ষষ্ঠী :** বোধনের মাধ্যমে দেবীর আনুষ্ঠানিক আগমন।

সপ্তমী : নবপত্রিকা স্নান, পূজা ও অন্যান্য আচার পালিত হয়।

অষ্টমী : অঞ্জলি, মহাষ্টমীর পূজা এবং বহু স্থানে কুমারী পূজা— এদিনের প্রধান আকর্ষণ। **সন্ধিপূজা :** অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণকে বিশেষ পবিত্র সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

নবমী : মহানবমীর পূজা ও ভোগ। **দশমী :** দেবীর বিসর্জন। আনন্দের সঙ্গে মিশে যায় বিচ্ছেদের আবেগ— **'আবার এসো মা।'**

এই বিদায়ের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের অনিত্যতার বোধও খুঁজে পাওয়া যায়— রূপ আসে, পূর্ণতা পায়, তারপর রূপান্তরিত হয়।

৭. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও মা দুর্গার 'মাতৃভাব'

বাঙ্গালির শক্তিসাধনার ইতিহাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনায় 'মা' ছিল অত্যন্ত কেন্দ্রীয় ধারণা। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা বিষয়ক প্রামাণ্য বিবরণে তাঁর সঙ্গে 'মাতৃভাব'-এর গভীর সম্পর্ক এবং ঈশ্বরকে মা হিসেবে অনুভব করার সাধনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মা কেবল মন্দিরের প্রতিমা নন; তিনি জীবন্ত চেতনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি দুর্গাপূজাকে একটি গভীর মানবিক অর্থ দেয়। দেবীকে পূজা করার পাশাপাশি মানুষের মধ্যেও দেবত্ব উপলব্ধির শিক্ষা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ভাবনার সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার একটি মূল ধারণা যুক্ত— প্রত্যেক জীবের মধ্যে চৈতন্যের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, মন্দিরে দেবীকে প্রণাম এবং জীবনের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা— দুটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

৮. মা সারদা : 'জীবন্ত দুর্গা' ও নারীত্বের মর্যাদা

দুর্গাপূজার সঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সম্পর্ক এই উৎসবকে একটি বিশেষ দার্শনিক উচ্চতা দিয়েছে। ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমা-সহ দুর্গাপূজার আয়োজন করেন স্বামী বিবেকানন্দ। বেলুড় মঠের সরকারি বিবরণ অনুযায়ী, এই পূজা আয়োজনের আগে তিনি মা সারদাদেবীর অনুমোদন গ্রহণ করেছিলেন। মা সারদা পূজায় উপস্থিতও ছিলেন। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো— বেলুড় মঠের সেই প্রথম দুর্গাপূজা মা সারদাদেবীর নামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ সন্ন্যাসীদের জন্য এই ধরনের গৃহস্থাচারমূলক পূজার বিশেষ বিধিনিষেধ ছিল। এখানে দুর্গাপূজা ও নারীত্বের মর্যাদার মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র তৈরি হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মা সারদাদেবীকে 'জীবন্ত দুর্গা' হিসেবে দেখেছিলেন— বেলুড় মঠের ঐতিহাসিক নথিতে তাঁর এই ভাবনার উল্লেখ রয়েছে। এখানেই দুর্গাপূজার একটি আধুনিক সামাজিক তাৎপর্য প্রকাশ পায়; নারীকে শুধু পূজার প্রতিমা হিসেবে নয়, জীবন্ত মানুষ হিসেবে সম্মান করা।

৯. বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা : শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার এক অনন্য অধ্যায়

১৯০১ সালের দুর্গাপূজা বাঙ্গালি তথা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে। বেলুড় মঠের তথ্য অনুযায়ী, ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমা-সহ দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দ নিজে এই পূজার সুচনা করেন। ১৮ অক্টোবর ১৯০১ সালে ষষ্ঠীর বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূজায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সামাজিক স্তরের মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন— বেলুড় মঠের বর্ণনায় সেই সময়ের ব্যাপক জনসমাগমের কথা উল্লেখ আছে। এই পূজার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল কুমারীপূজা। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় কুমারীর মধ্যে দেবীভাব উপলব্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। বেলুড় মঠের বিবরণে বলা হয়েছে, প্রথম দুর্গাপূজায় স্বামী বিবেকানন্দ একাধিক কুমারীর পূজা করেছিলেন; বর্তমানে সেখানে একজন কুমারীর পূজা করা হয়। বলির পরিবর্তে প্রতীকী নিবেদন, বেলুড় মঠের ইতিহাসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে। ১৯০১ সালের প্রথম পূজায় পশুবলির ইচ্ছা থাকলেও মা সারদাদেবী তা অনুমোদন করেননি। তাঁর নির্দেশ অনুসারে বেলুড় মঠে পশুবলি প্রচলিত হয়নি; প্রতীকীভাবে কলা নিবেদনের প্রথা গ্রহণ করা হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই— ঐতিহ্যের মধ্যেও নৈতিক পুনর্ব্যাখ্যা ও রূপান্তরের সম্ভাবনা থাকে।

১০. কুমারীপূজা : নারীর মধ্যে দেবত্বের স্বীকৃতি

কুমারীপূজা দুর্গাপূজার অন্যতম গভীর প্রতীকী আচার। একটি শিশুকন্যাকে দেবীর জীবন্ত প্রকাশ হিসেবে সম্মান জানানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে শক্তি, পবিত্রতা, সম্ভাবনা ও নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা। বেলুড় মঠের ঐতিহ্যে কুমারীপূজাকে অষ্টমীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

হিসেবে পালন করা হয়। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কুমারী-ভাবনারও উল্লেখ রয়েছে। এই রীতিকে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার আলোকে দেখলে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়— নারীকে সম্মান করা শুধু সামাজিক কর্তব্য নয়; ভারতীয় শক্তিদর্শনে নারীত্বকে সৃষ্টিশীল শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। অবশ্যই, এই ধর্মীয় প্রতীককে বাস্তব সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার, শিক্ষা, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সমতার সঙ্গে যুক্ত করাই এর আধুনিক তাৎপর্যকে আরও গভীর করে।

১১. দুর্গাপূজা ও ভারতীয় Knowledge Systems বা ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা

আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে Indian Knowledge Systems (IKS) নিয়ে নতুন করে গবেষণা ও আলোচনা হচ্ছে। ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রকের IKS Division-এর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে সংরক্ষণ, গবেষণা এবং আধুনিক সামাজিক প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করা রয়েছে।

দুর্গাপূজাকে এই বহত্তর জ্ঞানপরম্পরার একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক উদাহরণ হিসেবে অধ্যয়ন করা যায়। কারণ একটি দুর্গাপূজার মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করে— **ক. দর্শন :** শক্তি, প্রকৃতি, চৈতন্য, ধর্ম ও অধর্মের ধারণা। **খ. স্থাপত্য :** ঠাকুরদালান থেকে আধুনিক প্যান্ডেল— অস্থায়ী স্থাপত্যের সৃজনশীল ব্যবহার। **গ. মৃৎশিল্প :** মাটি, খড়, বাঁশ ও প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে প্রতিমা নির্মাণ। **ঘ. সঙ্গীত :** ঢাক, কাঁসর, শঙ্খ, আগমনী গান, চণ্ডীপাঠ এবং আধুনিক সংগীত। **ঙ. নাট্য ও নৃত্য :** ধুনুচি নাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন লোকশিল্প। **চ. খাদ্যসংস্কৃতি :** ভোগ, খিচুড়ি, লাবড়া, পায়েস, মিষ্টি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক খাদ্যপ্রথা। **ছ. সামাজিক সংগঠন :** পূজাকমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, চাঁদা শ্রমবণ্টন, নিরাপত্তা ও জনপরিচালনা। **জ. পরিবেশজ্ঞান :** মাটি, জল ও প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে উৎসবের সম্পর্ক। অতএব, দুর্গাপূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়— এটি একটি সমন্বিত জ্ঞান-সংস্কৃতি ব্যবস্থা।

১২. USESCO স্বীকৃতি : বিশ্বমঞ্চে বঙ্গের দুর্গাপূজা

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে UNESCO দুর্গাপূজাকে মানবতার অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। UNESCO-এর সিদ্ধান্তে দুর্গাপূজার সঙ্গে যুক্ত পরিবার, পূজাকমিটি, পুরোহিত, ঢাকি, শিল্পী ও কারিগরদের ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। UNESCO Intangible Cultural Heritage-এই স্বীকৃতির বিশেষ দিক হলো— UNESCO কেবল প্রতিমা বা ধর্মীয় আচারকে স্বীকৃতি দেয়নি; বরং সমগ্র সাংস্কৃতিক ecosystem-কে গুরুত্ব দিয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে :

শিল্পী, কারিগর, সংগীতশিল্পী, ঢাকি, পুরোহিত, আলোকশিল্পী, প্যান্ডেল নির্মাতা, স্বেচ্ছাসেবক, দর্শনার্থী, পূজাকমিটি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকও দুর্গাপূজাকে নৃত্য, সংগীত, কারুশিল্প, আচার, খাদ্য ও সামাজিক সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

১৩. আধুনিক প্যান্ডেল : ধর্ম, শিল্প স্থাপত্যের নতুন ভাষা

আধুনিক কলকাতার দুর্গাপূজা এক নতুন শিল্পভাষা তৈরি করেছে। প্যান্ডেল এখন কখনো মন্দিরের অনুকরণ, কখনো গ্রামবঙ্গের বাড়ি, কখনো কোনো ঐতিহাসিক স্থাপত্য, কখনো লোকশিল্প, কখনো পরিবেশবান্ধব ইনস্টলেশন, আবার কখনো সমকালীন সামাজিক বিষয়ের শিল্পিত প্রকাশ। এখানে একজন স্থপতি, শিল্পী, আলোকশিল্পী, ভাস্কর, গ্রাফিক ডিজাইনার, মৃৎশিল্পী, কারিগর ও সংগঠনের সম্মিলিত কাজ দেখা যায়। UNESCO-ও দুর্গাপূজাকে শিল্পী ও ডিজাইনারদের সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই কারণে আধুনিক প্যান্ডেলকে শুধু 'সাজসজ্জা' বললে তার শিল্পমূল্য কমিয়ে দেখা হয়। অনেক প্যান্ডেল আসলে temporary architecture বা অস্থায়ী স্থাপত্যের পরীক্ষাগার।

১৪. পরিবেশবান্ধব দুর্গাপূজা : ঐতিহ্যের নতুন দায়িত্ব

দুর্গাপূজার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাটি থেকে প্রতিমা তৈরি এবং জলে বিসর্জনের ঐতিহ্য প্রকৃতির সঙ্গে একটি চক্রাকার সম্পর্কের ধারণা বহন করে। কিন্তু আধুনিক সময়ে রং, প্লাস্টিক, থার্মোকল, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার, বর্জ্য এবং নদীদূষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। UNESCO-এর ২০২১ সালের সিদ্ধান্তে দুর্গাপূজার ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি পরিবেশগতভাবে টেকসই ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল আর্কাইভ ও জনসম্পৃক্ততার মতো উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব ভবিষ্যতের দুর্গাপূজার মূল প্রশ্ন হতে পারে— কীভাবে ঐতিহ্যকে রক্ষা করে পরিবেশকেও রক্ষা করা যায়? এর সম্ভাব্য পথ— প্রাকৃতিক বা কম দূষণকারী রং, মাটির প্রতিমা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্যান্ডেল উপকরণ, প্লাস্টিক কমানো,বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আলো, বর্জ্য পৃথকীকরণ, জলাশয় রক্ষায় সচেতনতা এবং পরিবেশবান্ধব বিসর্জন ব্যবস্থা।

১৫. দুর্গাপূজা ও সামাজিক সম্প্রীতি

দুর্গাপূজার অন্যতম শক্তি হলো সামাজিক অংশগ্রহণ। UNESCO-এর বিবরণে বলা হয়েছে, দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজন অতিক্রম করে মানুষ প্যান্ডেল পরিদর্শন করে। এটি বঙ্গের সামাজিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে— উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। একটি পাড়ার পূজায় থাকতে পারেন— প্রবীণ মানুষ, শিশু, তরুণ-তরুণী, শিল্পী, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, বিভিন্ন পেশার মানুষ। প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে উৎসবের অংশ হয়ে ওঠেন। এই অংশগ্রহণমূলক চরিত্রই দুর্গাপূজাকে একটি community-based cultural tradition হিসেবে শক্তিশালী করেছে।

১৬. অর্থনীতি ও জীবিকার সঙ্গে দুর্গাপূজার সম্পর্ক

দুর্গাপূজা একটি বিশাল সাংস্কৃতিক অর্থনীতিও সৃষ্টি করে। প্রতিমা নির্মাতা, বাঁশশিল্পী, মৃৎশিল্পী, কাঠমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রংশিল্পী, আলোকশিল্পী, ঢাকি, ফুল বিক্রেতা, পুরোহিত, পরিবহণকর্মী, পোশাক ব্যবসায়ী, খাদ্য বিক্রেতা, মিষ্টির দোকান, মুদ্রণ ও বিজ্ঞাপন শিল্প— অসংখ্য মানুষের জীবিকা উৎসবের সঙ্গে যুক্ত। ভারত সরকারের Incredible India পোর্টালও দুর্গাপূজার সঙ্গে শিল্পী, কারিগর,

সজ্জাশিল্পী ও স্থানীয় ব্যবসার ব্যাপক সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছে। সুতরাং দুর্গাপূজা একদিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অন্যদিকে একটি বৃহৎ সৃজনশীল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র।

১৭. বর্তমান যুগে ডিজিটাল দুর্গাপূজা

আজকের দুর্গাপূজা শুধু প্যান্ডেলে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, লাইভ স্ট্রিমিং, ডিজিটাল পেমেন্ট, অনলাইন প্রচার, ডিজিটাল শিল্প, ড্রোন ফোটোগ্রাফি ও ভিডিয়ো, ভার্চুয়াল দর্শন— সবকিছুই উৎসবের অংশ হয়ে উঠছে। এর ফলে বিদেশে বসবাসকারী বাঙ্গালিও কলকাতার পূজার সঙ্গে মুহূর্তে যুক্ত হতে পারেন। এই প্রযুক্তি ঐতিহ্যের বিকল্প নয়; বরং সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি হতে পারে ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। UNESCO-এর দুর্গাপূজা সংরক্ষণ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তেও ডিজিটাল আর্কাইভ ও প্রশিক্ষণের মতো উদ্যোগের উল্লেখ রয়েছে।

১৮. বর্তমান দুর্গাপূজায় অন্তর্ভুক্তি ও সহজবোধ্যতা

দুর্গাপূজার ভবিষ্যৎ কেবল আরও বড়ো প্যান্ডেল বা আরও বেশি আলো নয়; বরং আরও বেশি মানুষকে উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। UNESCO এবং UN India সাম্প্রতিক উদ্যোগে দুর্গাপূজাকে আরও সহজবোধ্য করার জন্য প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং অন্যান্য মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলেছে। এই ভাবনা ভারতীয় সংস্কৃতির 'সর্বজনীন মঙ্গল' ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, ভবিষ্যতের একটি আদর্শ পূজা হতে পারে— আধ্যাত্মিকতায় গভীর, শিল্পে সমৃদ্ধ, পরিবেশে দায়িত্বশীল এবং অংশগ্রহণে সর্বজনীন।

১৯. শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ভাবধারায় দুর্গাপূজার আধুনিক শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় দুর্গাপূজার কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথম শিক্ষা—মাতৃভাব

ঈশ্বরকে মা হিসেবে অনুভব করা মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণের একটি গভীর মানসিক সম্পর্ক তৈরি করে। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা বিষয়ক ব্যাখ্যায় এই মাতৃভাবকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় শিক্ষা—নারীর মর্যাদা

কুমারীপূজা এবং মা সারদাদেবীর 'জীবন্ত দুর্গা' ভাবনা নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধার একটি শক্তিশীল প্রতীক।

তৃতীয় শিক্ষা—সেবাই সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারায় আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক সেবার সমন্বয় একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। অতএব, দুর্গাপূজার সত্যিকার শিক্ষা কেবল ফুল, ধূপ ও অঞ্জলিতে শেষ হয় না। তা মানুষের জীবনে সেবা, সহমর্মিতা, চরিত্রগঠন ও মানবিকতার রূপ নিতে পারে।

২০. বাঙ্গালির দুর্গাপূজা : লোকসংস্কৃতি থেকে বিশ্বসংস্কৃতি

একটি উৎসব কীভাবে স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক হতে পারে, দুর্গাপূজা তার অসাধারণ উদাহরণ।

একদিকে— শিউলি, কাশফুল, ঢাক, ধুনুচি, আগামী, ঠাকুরদালান, কুমোরটুলি।

অন্যদিকে— আধুনিক শিল্প, স্থাপত্য, আলোকসজ্জা, ডিজিটাল মিডিয়া, আন্তর্জাতিক পর্যটন ও UNESCO স্বীকৃতি।

এই দুইয়ের সমন্বয়ই দুর্গাপূজার শক্তি। এটি পুরনোকে পরিত্যাগ করে নতুন হয়নি; বরং পুরনোকে সঙ্গে নিয়ে নতুনকে গ্রহণ করেছে। এ কারণেই দুর্গাপূজা আজও জীবন্ত।

২১. দুর্গাপূজা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

একবিংশ শতাব্দী শিশুর কাছে দুর্গাপূজা কী অর্থ বহন করবে? শুধু নতুন জামা, প্যান্ডেল দেখা ও ভোগ খাওয়া নয়। তাকে শেখানো যেতে পারে— প্রতিমা কীভাবে তৈরি হয়; কুমোরটুলির শিল্পীদের জীবন; আগমনী গানের ইতিহাস; ঢাকের তাল; প্যান্ডেল স্থাপত্য; বঙ্গের বনেদি বাড়ির ইতিহাস; শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব; মা সারদার নারী-মর্যাদার শিক্ষা; পরিবেশবান্ধব পূজা; সামাজিক সেবা; এবং ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় প্রকৃতি, সমাজ ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক। এই শিক্ষাই দুর্গাপূজাকে শুধু উৎসব থেকে জ্ঞান ও সংস্কৃতির শিক্ষাক্ষেত্রে রূপান্তর করতে পারে।

২২. দুর্গাপূজার ভবিষ্যৎ : 'ঐতিহ্য + জ্ঞান+প্রযুক্তি +মানবিকতা'

আগামী দিনের দুর্গাপূজা কেমন হবে, তার উত্তর আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত। আমরা যদি— ঐতিহ্য সংরক্ষণ করি, শিল্পীদের সম্মান করি, নারীর মর্যাদা রক্ষা করি, প্রকৃতিকে ভালোবাসি, প্রযুক্তিকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করি, শিশু ও তরুণদের ইতিহাস শেখাই এবং উৎসবকে সামাজিক সেবার সঙ্গে যুক্ত করি— তাহলে দুর্গাপূজা আরও শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবে।

'মা' শুধু প্রতিমায় নন

বাঙ্গালির দুর্গাপূজা শেষপর্যন্ত আমাদের একটি গভীর প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়— আমরা দেবীকে কোথায় খুঁজব?

মৃন্ময়ী প্রতিমায়? নিশ্চয়ই। মন্ত্রে? অবশ্যই। ঢাকের শব্দে? হ্যাঁ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব, মা সারদার জীবন এবং স্বামী বিবেকানন্দের কর্মদর্শনের আলোকে দেখলে দেবীকে মানুষের মধ্যেও অনুভব করা যায়। ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে, অসহায়ের মধ্যে, শিশুর হাসিতে, নারীর মর্যাদায়, প্রকৃতির সুরক্ষায়, শিল্পীর শ্রমে এবং মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসায়। তাই দুর্গাপূজার প্রকৃত বার্তা শুধু— 'অশুভের বিনাশ' নয়; বরং— শক্তির জাগরণ, জ্ঞানের উন্মেষ, মানবতার বিকাশ এবং সর্বজনীন মঙ্গলের সাধনা। বঙ্গের শরৎ তাই কেবল একটি ঋতু নয়। এটি বাঙ্গালির সম্মিলিত স্মৃতি। ঢাকের প্রতিটি বোল যেন বলে— মা এসেছেন। আর বিসর্জনের শেষ শঙ্খধ্বনি যেন বলে— মা চলে যাননি; তিনি ফিরে গেছেন আমাদের অন্তরে। এই অন্তর্গত শক্তি, মানবিকতা ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারই বাঙ্গালির দুর্গাপূজাকে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা ও সংস্কৃতির এক অনন্য জীবন্ত ঐতিহ্য করে তুলেছে।

(লেখক সিস্টেম ম্যানেজার ও প্রফেসর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৭৩)



বীরত্বের আরাধনা ও চর্চাই দুর্গাপূজার একমাত্র পন্থা ও উদ্দেশ্য

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত 'শ্রীশ্রী চণ্ডী'র ভূমিকা খণ্ডে অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর মত অনুসারে উল্লেখিত হয়েছে যে বঙ্গদেশে মহিষমর্দিনী মূর্তির পূজা এক হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন। এ দাবির সারবত্তা প্রমাণিত হয় নিউইয়র্কের মেট মিউজিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পালযুগের বেশ কয়েকটি মহিষমর্দিনী মূর্তির সংগ্রহ থেকে, যা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য এই প্রতিবেদকের হয়েছে। তবে সেই প্রাচীনকাল থেকে যুদ্ধের দেবী দুর্গার পূজা বাঙ্গালি কেন করে আসছে সে প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধান লেখার বিষয়বস্তু না হওয়া সত্ত্বেও এ লেখা থেকে হয়তো পৌঁছনো যাবে যে উত্তরেও। তবে দুর্গাপূজা যে বীরত্ব অর্জনের প্রার্থনায় মহাশক্তির পূজা এবং দুর্গাপূজার সঙ্গে বীরত্বাকাঙ্ক্ষা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সে কথাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

বাঙ্গালির সারাবছরের অপেক্ষা এসে শেষ হয় আশ্বিনের এক 'শারদপ্রাতে' আর বাঙ্গালির বীরত্বের কথা স্মরণে আনতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যাঁর কথা মনের দুয়ারে ঘা দিয়ে যায় সর্বপ্রথম, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩০-এর দশকের শেষার্ধে উত্তর কলকাতার এক বারোয়ারি দুর্গাপূজায় পূজাদর্শন করে যিনি হয়ে পড়েছিলেন ভাববিহ্বল এবং দিয়েছিলেন জনতার হৃদয় মথিত করা এক বক্তৃতা। অতঃপর তার পাঁচ বছরের মধ্যে নেতাজী ছাড়েন দেশ, দায়িত্ব নেন আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের বীজ বপণ করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মন্ত্রে তাঁদেরকে করেন প্রাণিত এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হন ব্রিটিশের কবল থেকে ভারতমাতার মুক্তি হেতু। উত্তর কলকাতার সেই বারোয়ারি দুর্গাপূজার বীরাষ্টমী উদ্‌যাপনের ভক্তিপূর্ণ দর্শনই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ঘটিয়েছিল অতুলনীয় বীরত্বের সেই অভূতপূর্ব জাগরণ— এমন কল্পনায় মন দ্রবীভূত হয়।

মহাশক্তি মা দুর্গার পূজায় নেতাজী গোড়া থেকেই ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণের পর ১৯২৫-এর ৬ জুলাই তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকেও মহাশক্তির মূর্ত রূপ হয়ে বঙ্গের যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করার আবেদন তিনি জানিয়েছিলেন বার্মার মান্দালয় জেল থেকে, এক পত্রের মাধ্যমে। আরও আটজন অতি বিশিষ্ট যুব সংগ্রামীর সঙ্গে লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। মাতৃরূপে 'শক্তি' দর্শন ও আত্মশক্তির জাগরণে মাতৃমন্ত্রের অপরিহার্যতাবোধ এই মহাবীর বাঙ্গালির মধ্যে ছিল সহজাত। এতটাই, যে মান্দালয় জেলে তাঁর নেতৃত্বে আয়োজিত হয়েছিল দুর্গাপূজা।

ওই একই বছর ১১ সেপ্টেম্বর মেজবউদিদি বিভাবতী বসুকে নেতাজী লেখেন, "Arrangements are being made here for Durga Puja. We hope we shall be able to worship the Mother here. ...Please do not forget to send Puja clothing here– – we have to spend Bijoya Dashami here after all." চিঠির শুরুতে লেখেন, "The Great Durga be with us". সে বছর অষ্টমীর দিন বাসন্তী দেবীকে নেতাজী লেখেন, 'আজ মহাষ্টমী। আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে এই কারাগারের মধ্যেও তাঁকে আমরা পেয়েছি। অর্থাৎ 'মা' আমাদের ভুলে যাননি বলেই তাঁর পূজার আয়োজন করতে পেরেছি।'

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৯২৮ সালে নেতাজী রচিত 'তরুণের স্বপ্ন' বইয়ের এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'বাঙ্গলাদেশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দুই কারণে খুব আশা হয় : (১) ব্যায়াম চর্চা ও ভূপর্যটনের স্পৃহা, (২) তরুণের জাগরণ। কাপুরুষ বলে বাঙ্গালির একদিন পৃথিবীতে অপবাদ ছিল— সে অপবাদ এখন গেছে। বাঙ্গালির পরম শত্রু যিনি, তিনিও বোধ হয় এখন বাঙ্গালিকে সে অপবাদ দিতে সাহসী হবেন না।' এ রচনা ১৯২৬-এ রচিত এক প্রবন্ধের অংশ যা থেকে বোঝা যায় যে বাঙ্গালির 'কাপুরুষ' বদনাম ছিল এবং তা দূর হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যেই। অনুমান করা যায় যে বাঙ্গালির কাপুরুষতা দূরীকরণের মূল চালিকাশক্তি ছিল স্বদেশী আন্দোলন। অর্থাৎ বাঙ্গালি বীরত্বের প্রতিভূ হিসেবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে চিন্তনে আজ যে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়েছে, সেই বীরত্বের জাগরণ ঘটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের কালখণ্ডে যে সময়ে, ১৯০২ সালে, শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথিকে প্রাচীন কালের মতো 'বীরাষ্টমী' হিসেবে উদযাপন করার প্রথার পুনরাস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরানী। এই মহীয়সী ব্যক্তিত্বের কিঞ্চিৎ সবিস্তার উল্লেখ ব্যতীত ১৯৩০-এর দশকে কলকাতার বারোয়ারি পূজার 'বীরাষ্টমী' দর্শনে নেতাজীর ভাববিহ্বলতাকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

সরলা দেবী চৌধুরানীও প্রতিভাত হয়েছিলেন 'শক্তি'র মূর্তিময়ী আধার রূপে। তাঁর আত্মজীবনীর একটি অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো যা বর্তমান বঙ্গজীবনেও সমধিক প্রাসঙ্গিক। আজ থেকে ১২৪ বছর আগে এক ধীময়ী মহীয়সী যে প্রকার চিন্তনের মাধ্যমে বঙ্গসন্তানের

দৈনন্দিন জীবনে পৌরুষ ও বীরত্বের চর্চাকে করে তুলেছিলেন তৎকালীন বঙ্গজীবনের অঙ্গ এবং সেকালের বঙ্গমাতাদের অভিমন্ত্রিত করেছিলেন সন্তানকে বীরত্ব অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে, তারই ফলশ্রুতিতে অবিভক্ত বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন যার গভীর প্রভাব রয়েছে বর্তমান ভারত সরকারের উপরেও। 'ভোকাল ফর লোকাল' একবিংশ শতাব্দীর স্বদেশী আন্দোলনেরই ভিন্ন এক রূপ।'

সরলা দেবী লিখেছেন, 'এবার আমার দৃষ্টি গেল বাঙ্গলায় একটি জাতীয় উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করার দিকে। যেমন মহরমের দিন মুসলমানদের নানারকম অস্ত্রচালনার প্রদর্শনী চলে পথেঘাটে, তার জন্য সারা বৎসর ধরে নানা আখড়ায় নানা নেতার অধীনে নানা দল সেগুলি ভাঁজতে থাকে; যেমন রামলীলা ও দশেরা বা বিজয়া দশমীর দিন বঙ্গের হিন্দু-ভারতে বীরোচিত নানা খেলাধুলা চলে, বাঙ্গলায় সেই রকম চালাতে হবে— কোন দিন? ওসব দেশের দশেরা আমাদের বিজয়া দশমীর মতো নয়, তাতে প্রতিমার ভাসানের পর্ব নেই। আমাদের ভাসানের দিন সবাই তারই আয়োজনে ব্যস্ত, সেদিন খেলাধুলার বিশেষ অনুষ্ঠানের অবসর হবে না বাঙ্গালিদের। অথচ ওই শারদীয় ঋতুতে যে সময়ে শমীবৃক্ষ থেকে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পাণ্ডবরা বীরভোগ্যা বসুন্ধরার অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন, সেই সময়েই বাঁধা হবে না। এইরূপ দ্বিধায় দোদুল্যমান যখন তখন বাঙ্গালির পঞ্জিকা হলেন আমার সহায়। হঠাৎ একদিন এ বছর দুর্গা পূজার ছুটি কবে থেকে আরম্ভ হবে তাই জানার জন্যে পঞ্জিকার পাতা উলটাতে উলটাতে চোখে পড়ল দুর্গা-পূজার অষ্টমীর আর একটি নাম 'বীরাষ্টমী' ব্রত' পালন করা ও ব্রতকথা শোনানোর বিধান।

আমার আর নতুন করে কোনো দিন উদ্ভাবন করতে হলো না, যা চাচ্ছিলুম পেয়ে গেলুম। বহুকাল ধরে বাংলাদেশের সংস্কারে যা রয়েছে কিন্তু বাঙ্গালির ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তারই পুনরুদ্ধার করা। বাঙ্গালি মায়েদের বীরমাতা হওয়ার লক্ষ্যপথে আবার নিয়ে আসা, সে বিষয়ে তাদের ব্রতের পুনঃপ্রচলন করা। ভীরু বাঙ্গালি মা'দের হাত দিয়েই ছেলের রক্ষাবন্ধন করিয়ে মায়ের নিজমুখে 'বীরোভব' বলে ছেলেকে বীরোচিত খেলাধুলায় কাজেকর্মে প্রবৃত্তি দেওয়ানো। মাতায়-পুত্রে মিলিত হয়ে দেশকে গৌরবশিখরে সমুন্নত রাখার প্রকৃষ্ট সাধনা যে দেশের ধর্মোৎসবের একটি অঙ্গ ছিল— সে দেশ আজ এত হীন এত পতিত হয়ে আছে কেমন করে? আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আজ আমায় দেশের অনেক ছেলে 'মা' বলে। না জেনে আগে থাকতেই আমি তাদের কারও কারও হাতে রক্ষাবন্ধন করেছিলুম। এখন যখন জানলুম ওই দিনে এদেশের দেশাচারই ওই মায়ের কর্তব্যই ওই, তখন ক্লাবে ক্লাবে সকল খেলোয়াড়ের হাতেই ওই দিন রাখী বেঁধে তাদের লোক-সমক্ষে খেলায় প্রবৃত্ত করানই হলো আমার ধর্ম— আমার প্রতি দেশমাতৃকার এইটিই আদেশ, নয়তো পঞ্জিকার ওই পৃষ্ঠাটির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ালেন কেন?

সেই থেকে আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা হলো। সেই বছরই মহাষ্টমীর দিন ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মাঠে ছেলেদের অস্ত্র-বিদ্যা-প্রদর্শনী ঘোষণা করা হলো। কলকাতায় যত ক্লাব আমার জানা ছিল সকলের কাছে আমন্ত্রণ গেল তাঁরা যেন উৎসবে যোগদান করেন ও খেলার প্রতিযোগিতায় নামেন। মুর্শিদাবাদের বিধবা নবাব-বেগম সাহেবার কন্যা সুজাতালি বেগের পত্নী আমার বন্ধু ছিলেন। লেসের পর্দা-ঘেরা একটা প্লাটফর্মের ভিতর আমার মা ও মাসিমাদের সঙ্গে তাঁকে বসিয়ে শেষে পর্দার ভিতর থেকে বাড়ান তাঁর হাত দিয়ে উৎসব-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করালুম-কাউকে মুষ্টি-যুদ্ধের জন্যে দস্তানা, কাউকে ছোরা, কাউকে লাঠি এবং প্রত্যেককেই একটি করে 'বীরাষ্টমী পদক'— তার এক পিঠে লেখা 'বীরোভব'-এক পিঠে 'দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ'। বীরাষ্টমী উৎসবের একটি অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও প্রস্তুত হলো। তার প্রধানাঙ্গ হচ্ছে একটি ফুলের মালায় সজ্জিত তলোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেশের পূর্ব পূর্ব বীরগণের বন্দনা-স্তোত্র ও তাঁদের নাম উচ্চারণ করে করে তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। সে স্তোত্রটি এই—

বীরাষ্টম্যাং মহাতিথৌ পূর্ব পূর্বগতান্ বীরান্
নমস্কুর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্
বীরকুলাগ্রগণ্যং শ্রীকৃষ্ণ-নন্দননন্দনম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাজলিং দদাম্যহম্।।
সানুজং শ্রীরামচন্দ্রং রঘুকুলপতিশ্রেষ্ঠম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণার্জুন-ভীমান্ সর্বপিতামহান
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
ইন্দ্রজয়ী মহাশূরং মেঘনাদারিপুত্রাসম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
রাজপুতকুলগর্বং প্রতাপমহাপ্রতাপম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
ছত্রপতি মহাবীরম্ মহারাষ্ট্রকুলনায়কম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
পঞ্জাবকেশরীং বীরং রণজিৎ ইতি খ্যাতম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
বঙ্গাধিপং মহাশৌর্যং প্রতাপাদিত্য বীরেশম্।
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
ক্ষত্রবংশসমুদ্ভূতং বঙ্গজং রায় সীতারামন্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
এতৎ সর্বেষান পূর্বগতান্ পদে পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্মঃ বয়ম্ অদ্য নমোনমঃ।।

যখন এক এক জনের নাম উচ্চারণ করে করে পুষ্পাঞ্জলি প্রক্ষেপ হতো, একটা ভীষণ উত্তেজনায় সমস্ত সভামণ্ডলী জাগ্রত হতো। এই স্তোত্রটির রচয়িতা খিদিরপুরের সেকালের প্রসিদ্ধ স্বদেশী আশুতোষ ঘোষ। বিভিন্ন খেলার মধ্যে মধ্যে এক একটি জাতীয় সঙ্গীতও সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত করে রাখত।

'বীরাষ্টমী'র উৎসব বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যে সব দেশ-ভক্তেরা কলকাতায় এসে যোগদান করতে পারতেন না, তাঁরা স্ব-স্ব নিবাস স্থানে এর অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। আমার উপদেশ ছিল— যে গ্রামে আর কিছু করার সুবিধে নেই, সেখানে এই

‘বীরাষ্টমী’কে উপলক্ষ্য করে মহাষ্টমীর দিন ছেলেরা যেন গ্রামের পুকুরে শুধু সন্তরণেরই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। মোট কথা, এই তিথিটিতে কোনো না কোনোরকম শারীরিক বলবীর্যের অনুষ্ঠান চাই, আর মায়ের হাতের রাখী নেওয়া চাই।’

এভাবেই বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বঙ্গদেশে পুনঃ উদ্‌যাপিত হতে আরম্ভ করে বীরাষ্টমী। যদি বলা হয় ‘শক্তি’রই এক রূপ পরিগ্রহ করে সে সময় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানী, তবে পাঠক কি তাতে অসম্মত হবেন? ঠিক এইভাবেই বঙ্গের নারীসমাজের বীরপ্রসবিনী হওয়ার অপরিহার্যতার কথা নেতাজী বলেছিলেন ১৯২৯ সালের এপ্রিল শ্রীহট্টের সুর্মা উপত্যকায় আয়োজিত ছাত্র সম্মেলনে। ‘‘...নারী সমাজ যে পর্যন্ত বীরপ্রসূ না হইতেছে, সে পর্যন্ত আমরা জাতি হিসেবে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃজাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে না বসাইতেছি সে পর্যন্ত এ দেশের নারী-জাতি বীর-প্রসবিনী হইতে পারেন না। আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে; স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার দিতে হইবে; উপযুক্ত স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে— এমনকী স্বাবলম্বী হইবার মতো অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে।’’ বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯২৭ সালে বার্মার মান্দালয় জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গঠনের অন্যতম মঞ্চ হিসেবে নেতাজী বেছে নিয়েছিলেন বারোয়ারি দুর্গাপূজাকে, বীরাষ্টমী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করেই। বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কাজের সূত্রে দক্ষিণ কলকাতার আদি লেক পল্লী, মধ্য কলকাতার ৪৭ পল্লী, উত্তর কলকাতার বাগবাজার, কুমারটুলি, সিমলা ব্যায়াম সমিতি ইত্যাদি পূজাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি আর সেই সূত্রে রত হয়েছিলেন পূজাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত জনমানসে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলার প্রয়াসে। ফলে অচিরেই কলকাতার বারোয়ারি দুর্গাপূজাগুলি হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিলনমণ্ডপ এবং সাধারণ জনমানসে জাতীয়তাবোধ জাগরণের প্রাঙ্গণ।

সিমলা ব্যায়াম সমিতি ছিল লাঠিখেলা, তলোয়ার চালনা, কুস্তি আদি শিক্ষণ ও অভ্যাসের অন্যতম প্রধান আখড়া, দেশমাতৃকার আরাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে যে আখড়ায় ১৯২৬ সালে শুরু করেছিল শারদীয়া দুর্গাপূজা। সারাবছরের শরীর চর্চা ও সাহসিকতার পরীক্ষা হেতু এই পূজায় মহাষ্টমী পালিত হতো ‘বীরাষ্টমী’ হিসেবে, দেবী দুর্গার সামনে যেদিন লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ আর তরবারি খেলার মাধ্যমে হতো সাহস ও শক্তি প্রদর্শনের পরীক্ষা। বেশ কয়েক বছর এহেন পুণ্য বীরাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৮ সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতির তৃতীয় বার্ষিক স্মরণিকা থেকে জানা যায় যে, সে বছর বীরাষ্টমী উৎসবের আয়োজনে হয়েছিল প্রবল আড়ম্বরপূর্ণ এবং উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মতো মহান ব্যক্তিত্ববর্গ।

১৯৩০ সালে নেতাজী নির্বাচিত হন কলকাতা পুরসভার মেয়র পদে এবং ওই বছরেই সিমলা ব্যায়াম সমিতি সার্বজনীন পূজা কমিটি তাঁকে বসায় সভাপতির আসনে। অতঃপর বীরাষ্টমী ব্রতের মহাউদ্‌যাপন যে বীরত্বের বিচ্ছুরণ ঘটাতে শুরু করল এবং সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজায় ঘটল যে প্রকার স্বদেশীকরণ এবং তার প্রভাব যেভাবে পড়ল স্থানীয় অর্থব্যবস্থায় তথা জনমানসে, যে ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার সে পূজাকে করল নিষিদ্ধ। ‘বীরাষ্টমী’ ব্রতের ফল মিলন হাতেনাতে।

বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা আরম্ভ হয় ১৯১৯ সালে যে পূজার গরিমা প্রতিষ্ঠার শুরুটি হয়েছিল ১৯৩০ সাল থেকে যে বছরে পূজার স্থান পরিবর্তিত হয়ে হয় বাগবাজার স্ট্রিট ও চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে (অর্থাৎ বাগবাজারের পূজার বর্তমান স্থান)। এই বছরেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যুক্ত হন বাগবাজারের পূজার সঙ্গেও। স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সদস্যদের লাঠিখেলা, শরীর চর্চা ইত্যাদি প্রদর্শন করার স্থানও হয়ে ওঠে বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সুবিশাল প্রাঙ্গণ এবং এই সকল বিদ্যার চর্চা হতো মহাষ্টমী তথা বীরাষ্টমীর দিনেই। কেউ কেউ বলেন যে ১৯৩৬ সালে বাগবাজারের বীরাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল সরলা দেবী চৌধুরানীর হাতে (যদিও সরলা দেবীর আত্মজীবনীতে এ ঘটনার উল্লেখ নেই) যে অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, ‘কাপুরুষতা, ভীরুতা সব মায়ের চরণে অর্পণ করে দেশমাতৃকার পূজার জন্য তৈরি হতে হবে। সে পূজার জন্য প্রয়োজন শুধু ত্যাগ।’ এই বছরেই বাগবাজারের বীরাষ্টমী উৎসবে লাঠিখেলা ইত্যাদি বীরত্বের প্রদর্শন ও শারীরিক কসরত দেখে ভাব বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন নেতাজী এবং দিয়েছিলেন এক আবেগঋদ্ধ ও গভীর প্রেরণাদায়ী যুবজাগরণের ভাষণ।

অর্থাৎ বঙ্গদেশে যে বীরাষ্টমী উৎসবের পুনরারম্ভ হয় সরলা দেবী চৌধুরানীর হাতে, বাগবাজারের দুর্গাপূজার পুণ্যমণ্ডপে দাঁড়িয়ে সেই বীরাষ্টমীর উদযাপন দেখে এবং সাধারণ বঙ্গপুঙ্গবদের বীরত্বব্যঞ্জক শারীরিক কসরত দেখেই দেশমাতৃকার মুক্তি হেতু মহাবীরত্বের আবেগে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন নেতাজী। তার মাত্র সাত-আট বছরের মধ্যেই গোটা বিশ্বের সম্মুখে দৃশ্যমান হয় সে বীরত্বের প্রকাশ। অর্থাৎ সর্বজনীন দুর্গাপূজার পুণ্যমণ্ডপে দুর্গাশক্তির উদ্ঘোষ হয়েছিল শক্তিরূপিনী সরলা দেবী চৌধুরানীর দ্বারা আর সে উদ্ঘোষেই অভিমন্দ্রিত হয়েছিলেন বাঙ্গালি বীরত্বের প্রতিভূ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। মহাকালের পুস্তিকায় এহেন ঘটনার তাৎপর্য অপরিসীম। বর্তমান কালখণ্ডে অবস্থান করেও সর্বজনীন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বীরত্ব অর্জন ও প্রয়োগের চর্চায় পুনর্মনোনিবেশ করতে বাঙ্গালিকে হবেই। তবেই বোঝা যাবে যে হাজার বছরেরও অধিককাল যাবৎ মহিষমর্দিনীর পূজা বাঙ্গালি কেন করে আসছে। সে প্রশ্নের উত্তর আছে বাঙ্গালির অন্তরের গভীরে। দেশমাতৃকার সত্যরক্ষার্থে বীরত্বের আরাধনা ও চর্চাই যে বাঙ্গালির দুর্গাপূজার একমাত্র পন্থা ও উদ্দেশ্য বিগত শতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহকে স্মরণ করলে তা উপলব্ধি করা যায় স্পষ্ট। □



আত্মসাধনার প্রতীক দুর্গাপূজা

শুভেন্দু সরকার

দেবী দুর্গার প্রতিকৃতিকে অধ্যাত্ম সাধনার প্রতীক হিসেবে সাধকরা দেখেছেন। অধ্যাত্মসাধন তত্ত্বে মা দুর্গার ব্যাখ্যা রয়েছে এইরকম যে, মায়ের দশটি হাত বোঝাচ্ছে যে সাধক তাঁর দশ ইন্দ্রিয় বা দশ প্রাণকে কীভাবে সংযত রেখেছেন। দশ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ প্রাণ বা দশ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত কর্ম সাধিত হয় ও সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রেখেছেন সাধক। মা দুর্গার পদতলে পশুরাজ সিংহ, তাকে তিনি দলন অর্থাৎ দমন করে রেখেছেন। তা কামের প্রতীক, তাকে একেবারে হত্যা করেননি, কারণ তা হলে সৃষ্টি ধ্বংস হবে। সাধক কামকে হত্যা না করে দমন করে রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। মা দুর্গা অসুরকে বধ করেছেন। অসুর হলো ক্রোধের প্রতীক। সাধকের উচিত ক্রোধকে হত্যা করা।

পাশে লক্ষ্মীদেবী, তাঁর বাহন পেঁচক। সাধকের সাধনা করতে করতে যখন তাঁর লক্ষ্মী লাভ হয়, তখন তাঁকে সাবধান করা হচ্ছে যে, যেন তাঁর পেঁচকের অবস্থা না আসে। পেঁচক দিবান্ধ ও নিশাচর। অর্থাৎ হে সাধক সাবধান থাকবে, ধনলাভ হলে তোমার পেঁচকের অবস্থা আসতে পারে। অপর পাশে সরস্বতী দেবী, তাঁর বাহন হংস। হংসের কাজ নীর ও ক্ষীর একত্রে থাকলে তা থেকে শুধু ক্ষীরকে গ্রহণ করা। সাধক যখন সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করেন, তখন তাঁর সঠিক জ্ঞান লাভ হওয়ার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তিনি তখন মলিন জগৎ সংসার হতে সার বস্তু বেছে নিতে সক্ষম হন। এই অবস্থাকেই 'পরমহংস' অবস্থা বলা হয়। কিন্তু সাধককে আরও অগ্রসর হতে হবে, কারণ তখনও তাঁর অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা লাভ হয়নি। পাশে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। তিনি বীরত্বের প্রতীক। সাধককে বীরত্বের সঙ্গে সাধনা করতে বলা হয়েছে।

কার্তিকেয়র বাহন ময়ূর। ময়ূরপুচ্ছে যে চক্ষু চিহ্ন লক্ষিত হয়, তা কুটস্থের (কপালে দুই ভ্রূর মাঝের অংশ) প্রতীক। সাধক বীরবিক্রমে সাধনা করতে থাকলে অবশ্যই কুটস্থ দর্শন হবে। কার্তিকেয়র হস্তে তির-ধনুক। শর অর্থে বাণ বা শ্বাসকে বুঝায় এবং ধনুক অর্থে দেহকে বুঝায়। এই দুর্গারূপী দেহ রথের ভিতরে শররূপী শ্বাসকে যিনি চালনা করেন (গুরু প্রদত্ত শিক্ষার দ্বারা) অর্থাৎ বীরত্বের সঙ্গে বায়ুক্রিয়া রূপ প্রাণকর্ম করেন তিনিই কার্তিকেয়। এত কষ্ট করে সাধক সাধনা করেন তাই তাঁর সিদ্ধি বা মুক্তি চাই, সেজন্য সিদ্ধিদাতা গণেশ। কিন্তু তাঁর বাহন মুষিক। মুষিকের ধর্ম অকারণে কিছু নষ্ট করা। তাই সেই অবস্থায় যেহেতু সাধক তখন অদ্বৈতে পূর্ণরূপে স্থিতিলাভ করতে পারেননি, সেহেতু তাকে তখনো অনিষ্টকারী হতে সাবধান থাকতে হবে। তা না হলে সিদ্ধি বা মুক্তি সাধকের করতলগত হবে না।

সবার উপরে আছেন শিব। তিনি ব্যোমতত্ত্ব। তিনি বিশ্বনাথ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর থাকবার স্থান নেই। অর্থাৎ সাধক পূর্ণরূপে ব্যোমতত্ত্বে অর্থাৎ অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তাঁর এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় আর নিজের বলতে কিছু থাকে না। তাঁর বস্ত্র নেই, ভস্ম মেখে বসে আছেন। অর্থাৎ সাধকের সব বিষয়ে ওই প্রকার ত্যাগ এসে থাকে। শিবের হাতে ডমরু, তার দু'দিক থেকে সমান বাদ্যধ্বনি ওঠে। ওঙ্কার ধ্বনির প্রতীক। সাধক ওঙ্কার ধ্বনি শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যান। শিবের অপর হস্তে ত্রিশূল। তা সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের প্রতীক। অর্থাৎ সাধকের ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভের প্রতীক। তাঁর কোমরে ও গলায় সর্প। সর্প হিংসার প্রতীক। সাধক তখন সকল প্রকার ইন্দ্রিয়কে দমন করে পূর্ণরূপে অহিংস অবস্থা লাভ করেছেন। সেই শিবের বাহন বৃষ। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চার পুরুষার্থ বৃষের চতুষ্পদের প্রতীক। শিব অর্থাৎ শূন্যতত্ত্ব। এই প্রকারে সাধক শূন্যতত্ত্ব লাভ করে জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শূন্য অর্থাৎ কিছুই নয়, এই কিছুই নয় অবস্থায় ব্রহ্ম লাভ।

কালান্তরে এই আধ্যাত্মিক সাধনা বিলুপ্তির কারণে আজ জগতে নানা অশান্তি। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা নামক শব্দগুলোর গুরুত্ব হারাচ্ছে। লোকচক্ষুর আড়ালে জগৎকে ঠকাতে গিয়ে নিজেরাই নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছি না। এর কারণই হলো হিন্দু জীবন পদ্ধতিতে সাধনা ভুলে, বাহ্যিক নানা আড়ম্বরে ও সংস্কারে মেতে উঠেছি আমরা। তাই জাগতিক সকল মানুষকেই হিন্দু জীবন দর্শনে বাহ্যিক পূজার আড়ম্বরে গুরুত্ব কমিয়ে, এই প্রকারের সমস্ত দেব-দেবীর তত্ত্বকে জেনে গুরু প্রদত্ত যোগ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণের সাধনা বা অধ্যাত্ম সাধনা করলে তবেই সিদ্ধি বা মুক্তি আসবে এবং জগতের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে। □

বাগবাজারের দুর্গাপূজার আড়ালে এক ইতিহাস, এক বিপ্লবের উত্তাপ

‘বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব’— দেবীর আরাধনার পাশাপাশি এখানে বেঁচে রয়েছে এক সময়ের স্বদেশি চেতনা, আত্মমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। আর সেই ইতিহাসের পাতায়, উত্তর কলকাতার এই চেনা প্রাঙ্গণে, আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, যাঁর মহাজীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়— দেশকে ভালোবাসার অর্থ শুধু তার জন্য স্বপ্ন দেখা নয়, সেই স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাওয়াও।

সৈকত নিয়োগী

কলকাতার দুর্গাপূজার ইতিহাসে এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে, যেগুলি শুধু উৎসবের ইতিহাস নয়, একটি সময়ের কথাও বলে। ঢাকের আওয়াজ, ধুনোর গন্ধ, শঙ্খধ্বনি আর আলোকমালায় সাজানো মণ্ডপের আড়ালে কখনও কখনও লুকিয়ে থাকে পরাধীন দেশের মুক্তির স্বপ্ন, মানুষের আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এমনকী বিপ্লবের উত্তাপও। বাঙ্গালির সবচেয়ে বড়ো উৎসবের সঙ্গে এভাবেই মিশে গিয়েছে তার সমাজজীবন, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস।

উত্তর কলকাতার বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা সেই ইতিহাসেরই এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আজও পুজোর দিনগুলিতে বাগবাজারের মণ্ডপে মানুষের ঢল নামে। একচালা প্রতিমার সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, এই তো আমাদের চেনা চিত্র, এই তো শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়া। কিন্তু এই পরিচিত উৎসবের আড়ালেই রয়েছে এমন এক অতীত, যেখানে দেবীর আরাধনার পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছিল স্বদেশি ভাবনা,



ফঃ ৩

দেশীয় শিল্পের প্রসার এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। সেই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম।

বাগবাজারের দুর্গাপূজার কথা বলতে গেলে তাই শুধু পুজোর আয়োজন কিংবা প্রতিমার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলেই চলে না। ফিরে তাকাতে হয় সেই সময়ের কলকাতার দিকে, যখন শহরের অলিগলিতে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতির পাশাপাশি দানা বাঁধছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তখন নানা পথে ছড়িয়ে পড়ছে। কোথাও রাজনৈতিক সভা, কোথাও শরীরচর্চার আখড়া, কোথাও দেশীয় শিল্পের প্রসার, আবার কোথাও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের দেশকে নতুন করে চিনতে চাইছে।

বাগবাজারের দুর্গাপূজাও সেই সময়ের আবহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সার্বজনীন দুর্গাপূজার মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল এক ধরনের সামাজিক তাৎপর্য। যে পূজা একসময় মূলত জমিদারবাড়ি কিংবা বিত্তশালী পরিবারের নিজস্ব আয়োজন ছিল, সর্বজনীনের হাত ধরে তা ক্রমশ হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের অনুষ্ঠান। পূজার আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য আর বিশেষ কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন রইল না। পাড়ার মানুষ একসঙ্গে এগিয়ে এলেন, গড়ে উঠল সম্মিলিত উদ্যোগের পরিসর। দুর্গাপূজার এই সামাজিক চরিত্রই পরবর্তী সময়ে তাকে বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করেছিল।

বাগবাজারের ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূজার সঙ্গে মেলার সংযোগ, দেশীয় পণ্যের প্রদর্শনী এবং মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ পূজাকে একটি বিস্তৃত সামাজিক পরিচয় দান করে। মণ্ডপের বাইরে তৈরি হয় আরও একটি জগৎ, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়, দেশীয় শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন দর্শনার্থীরা, আর উৎসবের আনন্দের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে নতুন ভাবনা।

এই ইতিহাসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম জড়িয়ে পড়ার তাৎপর্য এখানেই। সুভাষচন্দ্রের কাছে স্বদেশপ্রেম কেবল বক্তৃতার বিষয় ছিল না। দেশের মানুষের আত্মমর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় জীবনে আত্মনির্ভরতার প্রশ্ন তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। দেশীয় শিল্পের প্রসার, স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিস্তার ছিল সেই সময়ের স্বদেশি ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাগবাজারের দুর্গাপূজা ও মেলাকে ঘিরে যে উদ্যোগের কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে উঠে আসে, তার মধ্যেও এই ভাবনার প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়।

পাঁচশো টাকা! আজকের দিনে অঙ্কটি শুনে হয়তো তেমন কিছু মনে হবে না। কিন্তু ইতিহাসের কোনও উদ্যোগের গুরুত্ব কি শুধু টাকার অঙ্ক দিয়ে বোঝা যায়? যে সময়ে একটি জনউৎসবের জন্য পুরসভার জমি ব্যবহারের অনুমোদন এবং স্বদেশি মেলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল, তখন তার তাৎপর্য ছিল অনেক গভীর। এর মধ্যে ছিল একটি উৎসবকে আরও বড়ো পরিসরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, মানুষের কাছে পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষা এবং দেশীয় শিল্পকে পরিচিত করে তোলার ভাবনা।

১৯৩০ সাল থেকে 'বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী' নামটির প্রতিষ্ঠা এই পরিবর্তনেরই একটি উল্লেখযোগ্য দিক। নামের মধ্যেই যেন ধরা পড়েছিল দুর্গাপূজার নতুন পরিচয়। পূজার সঙ্গে যুক্ত হল প্রদর্শনী, মেলা এবং দেশীয় পণ্যের প্রসারের ভাবনা। দেবীর আরাধনা চলল নিজের স্বাভাবিক ছন্দে, আর তার পাশেই খুলে গেল দেশীয় শিল্প ও উৎপাদনের পরিচয় তুলে ধরার একটি মঞ্চ।

একবার কল্পনা করা যাক সেই সময়ের বাগবাজারের মেলার ছবি। পূজার দিন। চারদিকে মানুষের ভিড়। মণ্ডপে দেবী দর্শন সেরে কেউ এগিয়ে যাচ্ছেন মেলার দিকে। পরিবারের ছোটদের হাত ধরে ঘুরছেন অভিভাবকেরা। কোথাও দেশীয় কাপড়, কোথাও হস্তশিল্প, কোথাও স্থানীয় কারিগরের তৈরি নানা সামগ্রী। কেনাকাটার ব্যস্ততা, মানুষের কথাবার্তা আর উৎসবের কোলাহলে জমে উঠেছে চারপাশ।

এই দৃশ্যের মধ্যে হয়তো বাইরে থেকে দেখার মতো খুব অসাধারণ কিছু নেই। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ ছিল অন্য রকম। একটি দেশীয় কাপড় কেনা কিংবা দেশীয় কারিগরের তৈরি কোনো সামগ্রী ঘরে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও তখন স্বদেশি ভাবনার প্রকাশ ঘটতে পারত। কারণ দেশকে ভালোবাসা মানে শুধু দেশের জন্য আবেগ প্রকাশ করা নয়, দেশের মানুষের শ্রমকে মর্যাদা দেওয়া, তাদের তৈরি পণ্যের পাশে দাঁড়ানোও।

স্বদেশি আন্দোলন মানুষকে এই কথাই বুঝিয়েছিল যে, দেশের স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার প্রশ্নটিও তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাগবাজারের মেলার মতো একটি জনপরিসর সেই ভাবনাকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারত। যে কথা রাজনৈতিক সভায় শোনা যায়, তা কখনও কখনও মেলার দোকানে দাঁড়িয়েও উপলব্ধি করা সম্ভব।

বাগবাজারের দুর্গাপূজার বিশেষত্ব ছিল, এই সমস্ত উদ্যোগের মধ্যেও তার নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় অক্ষুণ্ণ ছিল। তাকে কেবল রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে দেখলে তার ইতিহাসের অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। দেবীর আরাধনা, পাড়ার মানুষের মিলন, উৎসবের আনন্দ এবং সাংস্কৃতিক চর্চা— এসবই ছিল তার প্রাণ। সেই পরিচিত পরিসরের মধ্যেই সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির নানা ভাবনা জায়গা করে নিয়েছিল। এই ইতিহাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়— 'বীরাষ্টমী ব্রত' উদ্‌যাপন। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে শরীরচর্চা, লাঠিখেলা এবং আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যুবকদের শারীরিকভাবে সক্ষম করে তোলা এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের বিকাশ ঘটানো ছিল সেই সময়ের বিভিন্ন সংগঠনের কাজের অন্যতম দিক। বাগবাজারের বীরাষ্টমী উৎসবের সঙ্গে লাঠিখেলা ও অস্ত্রচালনার কসরতের যে ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে, তা সেই সময়ের পরিবেশকে মনে করিয়ে দেয়।

দুর্গাপূজার অষ্টমীতে বীরত্বের এই উদ্‌যাপনের মধ্যে ছিল এক গভীর প্রতীকী অর্থ। বাঙ্গালির কাছে দুর্গা শুধু মাতৃরূপে পূজিতা নন, তিনি শক্তিরও প্রতীক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস, বিপদের মুখে অবিচল থাকার শক্তি এবং অশুভের বিনাশ— দেবীর রূপের সঙ্গে এই ভাবনাগুলি চিরকাল জড়িয়ে রয়েছে। পরাধীনতার সময়ে এই প্রতীকী অর্থ যে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছিল, তা সহজেই বোঝা যায়।

তবে 'বীরাষ্টমী'কে কোনো নির্দিষ্ট বিপ্লবী কার্যক্রম কিংবা গোপন বৈঠকের আড়াল হিসেবে দেখাতে হলে তার পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকা জরুরি। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা আমাদের সেই সতর্কতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কোনো ঘটনার গুরুত্ব বোঝাতে তাকে অতিরঞ্জিত

করার প্রয়োজন নেই। বাগবাজারের 'বীরাষ্টমী'র তাৎপর্য রয়েছে জনসমক্ষে সাহস, শারীরিক সক্ষমতা ও আত্মমর্যাদার চর্চাকে উৎসবের অংশ করে তোলার মধ্যেই।

এই 'বীরাষ্টমী'র ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের নামও। 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত এই বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বাগবাজারের দুর্গাপূজার সঙ্গে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্পর্ককে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। বঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে যে আত্মশক্তি ও সংগঠনের ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল— বাগবাজারের এই ঐতিহ্যের মধ্যে তারই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিফলন দেখা যায়।

আর এখানেই আবার ফিরে আসে সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ। ১৯৩৬ সালে 'বীরাষ্টমী' অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতির কথা বিভিন্ন বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে, ১৯৩৮-৩৯ সালে বাগবাজার সর্বজনীনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ তাঁর সঙ্গে এই দুর্গাপূজার সম্পর্ককে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। নেতাজীর মতো এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে উত্তর কলকাতার একটি জনউৎসবের এই সংযোগ নিছক আনুষ্ঠানিকতার বিষয় ছিল না। এর মধ্যে দিয়ে স্থানীয় সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের একটি যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল।

আমরা ভারতবাসী সাধারণত সুভাষচন্দ্র বসুকে স্মরণ করি স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দুরন্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন, দেশত্যাগ, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ, গঠন এবং স্বাধীনতার জন্য তাঁর আপোশহীন সংগ্রামের কথা আমাদের পরিচিত। কিন্তু তাঁর জীবনের এই বৃহত্তর ছবির বাইরে আরও একটি দিক রয়েছে— সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, সামাজিক উদ্যোগের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং জাতীয় চেতনাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা।

বাগবাজারের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ইতিহাস সেই দিকটির কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি পূজা, একটি মেলা কিংবা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যে মানুষের মধ্যে দেশ সম্পর্কে নতুন ভাবনা জাগিয়ে তুলতে পারে, এই ইতিহাস তারই পরিচয় বহন করে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সব সময় যে রাজনৈতিক মঞ্চেই প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়। কখনও তা প্রকাশিত হয়েছে দেশীয় শিল্পের প্রসারে, কখনও শরীরচর্চার আখড়ায়, কখনও আবার মানুষের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক উদ্যোগে।

ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে তাই শুধু রাজপথের শোভাযাত্রা, পদযাত্রা, কারাবাস কিংবা বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। তার শিকড় ছড়িয়ে ছিল সমাজের নানা স্তরে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রসমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতির আসর, শরীরচর্চার কেন্দ্র এবং জনউৎসব— সব জায়গাতেই মানুষ নিজের মতো করে খুঁজে নিয়েছিল 'স্বাধীনতা'র অর্থ।

বাগবাজারের দুর্গাপূজা সেই বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই পূজার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যোগাযোগ কিংবা বিপ্লবীদের আশ্রয় পাওয়ার প্রসঙ্গও কিছু ঐতিহাসিক বিবরণে উঠে এসেছে। তবে নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনার সঙ্গে গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপকে যুক্ত করতে হলে প্রামাণ্য নথির প্রয়োজন। ইতিহাসের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার চেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাগুলিকে বোঝার চেষ্টা অনেক বেশি জরুরি। কারণ বাগবাজারের দুর্গাপূজার ইতিহাসের প্রকৃত আকর্ষণ তার বাস্তব ঘটনাগুলির মধ্যেই নিহিত।

আজও শরৎ এলে বাগবাজারের পূজা নতুন করে জেগে ওঠে। মণ্ডপে আলো জ্বলে, ঢাকের তালে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ, মানুষের ভিড়ে ভরে যায় রাস্তা। একচালা প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ প্রার্থনা করেন, কেউ ফিরে পান শৈশবের স্মৃতি, কেউ আবার খুঁজে নেন কলকাতার পুরনো দিনের গন্ধ। উৎসবের এই চেনা আনন্দের মধ্যেই হয়তো অজান্তে মিশে থাকে ইতিহাসের দীর্ঘ ছায়া।

সেই ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়— বাগবাজারের দুর্গাপূজা শুধু একটি পুজোর নাম নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি সময়ের সামাজিক পরিবর্তন, স্বদেশি চেতনার প্রসার এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল এক সমাজের ছবি। মেলার মধ্যে দিয়ে দেশীয় শিল্পের পরিচয় ছড়িয়ে দেওয়া, 'বীরাষ্টমী' ব্রত উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সাহস ও আত্মমর্যাদার ঐতিহ্যকে সামনে আনা এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মতো এক জাতীয় নেতার সঙ্গে উৎসবের সম্পর্ক— এইসব মিলিয়েই বাগবাজারের দুর্গাপূজার ইতিহাস পেয়েছে এক স্বতন্ত্র মাত্রা।

সময় বদলেছে। বদলে গিয়েছে কলকাতার রাস্তাঘাট, মানুষের জীবনযাত্রা, পূজার আয়োজনও। কিন্তু কিছু স্মৃতি সময়ের সঙ্গে মুছে যায় না। বরং নতুন প্রজন্মের কাছে ফিরে আসে নতুন অর্থ নিয়ে।

বাগবাজারের দুর্গাপূজাও তেমনই এক স্মৃতিবাহী উৎসব। আজ যখন দেবী দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রণাম জানাই, তখন হয়তো আমাদের সবার মনে ইতিহাসের কথা আসে না। উৎসবের আনন্দেই আমরা মেতে থাকি। তবু সেই আনন্দেরই মধ্যে কোথাও মিশে থাকে পূর্বপুরুষদের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর আত্মপরিচয়ের স্মৃতি। বাগবাজারের দুর্গাপূজা সেই স্মৃতিকে নিঃশব্দে বহন করে চলেছে বছরের পর বছর।

দেবীর মুখের দিকে তাকালে মনে হয়— তিনি যেন শুধু একটি পরিবারের নন, একটি বৃহত্তর সমাজেরও আশ্রয়। তাঁর আগমন যেমন ঘরে ঘরে আনন্দ নিয়ে আসে, তেমনই তাঁর সঙ্গে ফিরে আসে বাঙ্গলার ইতিহাসের নানা অধ্যায়। সেই অধ্যায়ের কোথাও রয়েছে স্বদেশি মেলার ব্যস্ততা, কোথাও বীরাষ্টমীর সাহসী প্রদর্শন, কোথাও বা সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতির স্মৃতি।

ইতিহাস কখনও তৈরি হয় রাজপথে, কখনও রাজনৈতিক সভায়, কখনও কারাগারের অন্ধকারে। আবার কখনও তার কিছু উজ্জ্বল মুহূর্ত ছড়িয়ে থাকে একটি পূজামণ্ডপের আলোয়, একটি মেলার ভিড়ে কিংবা মানুষের সম্মিলিত উৎসবের মধ্যে।

'বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব' সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। দেবীর আরাধনার পাশাপাশি এখানে বেঁচে রয়েছে এক সময়ের স্বদেশি চেতনা, আত্মমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। আর সেই ইতিহাসের পাতায়, উত্তর কলকাতার এই চেনা প্রাঙ্গণে, আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, যাঁর মহাজীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়— দেশকে ভালোবাসার অর্থ শুধু তার জন্য স্বপ্ন দেখা নয়, সেই স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাওয়াও।

বাগবাজারের দুর্গাপূজা তাই কেবল অতীতের স্মারক নয়। এটি এমন এক ইতিহাস, যা প্রতি শরতে ফিরে আসে— ঢাকের বোলের সঙ্গে, ধুনোর গন্ধের সঙ্গে, আর একচালা প্রতিমার চিরচেনা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা অসংখ্য মানুষের নীরব অনুভবে। □



মানিকতলা সাধুখাঁ বাড়ির একশো পঁচিশ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গাপূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলের ১৪৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ সাধুখাঁ বাড়ির দুর্গাপূজা এবছর ১২৫তম বর্ষে পদার্পণ করলো। পূজার সুত্রপাত করেন বিশ্বনাথ প্রামাণিক। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বিশ্বনাথ প্রামাণিক তিন খিলানের ঠাকুরদালান তৈরি করেন। তার আগে ঠাকুরদালান ছিল মাটির দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনি দেওয়া। সেই ঠাকুরদালানেও দুর্গাপূজা হয়েছে। যদিও এর স্বপক্ষে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। শোনা যায়, মা দুর্গা বিশ্বনাথ প্রামাণিককে নতুন ঠাকুরদালান তৈরি করে নবনির্মিত ঠাকুরদালানে তাঁকে পূজা করার জন্য স্বপ্নাদেশ দেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বর্তমান ঠাকুরদালান নির্মাণ করেন। তদবধি ১২৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ঠাকুরদালানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বিশ্বনাথ প্রামাণিকের পরে পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর একমাত্র পুত্র নন্দলাল প্রামাণিক। নন্দলাল প্রামাণিকের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। পূজার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে তিনি তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় শ্যামাসুন্দর প্রামাণিককে দত্তক নেন। নন্দলাল তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী সঙ্গে রাখেন দৌহিত্র কৃষ্ণচন্দ্র সাধুখাঁকে। শ্যামাসুন্দর প্রামাণিক এবং কৃষ্ণচন্দ্র সাধুখাঁ দু'জনে একসঙ্গে কয়েক বছর দুর্গাপূজা করেছেন। শ্যামাসুন্দর ছিলেন অপুত্রক। তাঁর মৃত্যুর পরে কৃষ্ণচন্দ্র সাধুখাঁর উত্তরসূরিরা বর্তমানে দুর্গাপূজার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রতিপদাদি কল্পে দেবীর বোধন হয় মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে। সেদিন থেকে ঠাকুরঘরে পূজা, চণ্ডীপাঠ, আরতি শুরু হয়ে যায়। মহালয়া থেকে নবমী পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ, অধিবাস ও বিল্ববরণ। সপ্তমীর সকালে পরিবারের সদস্যরা নগ্নপদে নবপত্রিকা স্নান করাতে নিয়ে যান কুমোরটুলি ঘাটে। ফিরে এসে ঠাকুরদালানের বাইরের অংশে পূজা ও আরতির পরে গণেশের দক্ষিণপার্শ্বে 'নবপত্রিকা' স্থাপন করা হয়। এরপর সংকল্প, দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করে পূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সংকল্প হয় সেবায়েতের নামে।

রথযাত্রায় কাঠামো পূজোর পরে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। আগে ছিল মাটির সাজ। এখন ডাকের সাজের প্রতিমা। এক চালচিত্রে দেবী দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী সপরিবারে অধিষ্ঠিতা। অসুরের গায়ের রঙ সবুজ। সাধুখাঁ বাড়িতে পূজা হয় বৈষ্ণব মতে। তাই পশুবলির প্রথা নেই। সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপূজায় চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। নবমীতে বলি দেওয়া হয় চালকুমড়ো, আখ গাছ ও আদা গাছ।

অন্নভোগ না থাকায় লুচি, সুজি-সহ দেবীর ভোগে থাকে নানারকম মিষ্টি। অষ্টমীতে অতিরিক্ত ভোগ দেওয়া হয় সিমুয়ের পায়েস ও আলুর দম। সন্ধিপূজায় খোসা ছাড়ানো গোটা ফল দেবীকে নিবেদন করা হয়।

মহাষ্টমীতে 'কুমারী পূজা' সাধুখাঁ পরিবারের দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনূর্ধ্বা নবমবর্ষীয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে মালা পরিয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, পায়ে আলতা পরিয়ে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। সন্ধিপূজায় আরতির পরে 'ধুনো পোড়ানো' এদের এক প্রাচীন রীতি। মার কাছে কোনো মনস্কামনা থাকলে বা পারিবারিক মঙ্গল কামনায় মহিলারা এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান একান্তভাবে বিবাহিতা মহিলাদের জন্য। সন্ধিপূজায় বলির পরে ঠাকুরদালানে জ্বলে ওঠে ১০৮ প্রদীপের দীপমালা।

নবমীর সকালে যথাবিহিত পূজা, পুষ্পাঞ্জলি ও হোমের পরে 'দক্ষিণান্ত'। পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করে দুর্গাপূজার সমাপন। পূজার ব্যয় নির্বাহ হয় ট্রাস্ট থেকে।

সাধুখাঁ পরিবারের দুর্গাপূজার একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, বিজয়া দশমীতে আঁশ মুখ করে মাকে বিদায় জানানো। তাই মহালয়া থেকে নবমী পর্যন্ত নিরামিষ আহারের পরে বিজয়া দশমীতে এঁরা মৎস্য ভক্ষণ করেন।

পূজার ক'দিন পরিবারের সদস্যরা খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে মাতৃ আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন, যা বিষাদে পরিণত হয় বিজয়া দশমীতে। কেননা শাস্ত্রীয় বিধি মেনে মাকে বিদায় দিতে হবে। মন হয় ভারাক্রান্ত! 'মা, আগামী বছর আমাদের গৃহে আবার এসো'— এই প্রার্থনা জানিয়ে মাকে বিদায় জানানো হয়। পরিবারের সদস্য সিদ্ধার্থবাবু জানালেন, বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন দিয়ে ফিরে এসে শূন্য ঠাকুরদালানের দিকে তাকালে তারা একটা বেদনা অনুভব করেন।

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় বরণ করে ও কনকাঞ্জলি দিয়ে মাতৃমূর্তি নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিমতলা ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। ফিরে এসে পরিবারের সকলে কলাপাতায় 'দুর্গানাম' লেখেন। এরপর শান্তিজল গ্রহণ, বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টিমুখ করে দুর্গাপূজার পরিসমাপ্তি ঘটে। জাঁকজমকের আধিক্য না থাকলেও সাধুখাঁ পরিবারের দুর্গাপূজার প্রতিটি আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিষ্ঠা, ভক্তি ও শুদ্ধাচারে পালিত হয়। □





ঐতিহ্য ও পরম্পরার জীবন্ত দলিল

পাঁচথুপির দুর্গাপূজা

জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ

কালের বিবর্তনে রাজ্যপাট অবলুপ্ত হলেও আভিজাত্যের সেই চেনা সৌরভ আজও একই পরম্পরায় প্রবহমান। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বড়ঞা ব্লকের ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক জনপদ পাঁচথুপি। বর্তমান পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় এটি ঐতিহ্য ও পরম্পরার এক জীবন্ত দলিল।

এই গ্রাম শুধু ভৌগোলিক মানচিত্রের অংশ নয়, এটি প্রাচীন সনাতন সংস্কৃতি, বৈদিক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় বিশুদ্ধ বাঙ্গালি সংস্কৃতির এক মিলনতীর্থ। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো শ্বেতশুভ্র মেঘরাশি, নদীর তীরে সাদা কাশফুল আর শিউলি ফুলের সৌরভ শরতের আগমনী বার্তা বয়ে আনে।

শরতের আগমনে এই প্রাচীন জনপদ রূপান্তরিত হয় এক অলৌকিক দুর্গাগ্রামে। আধুনিক যুগের থিম বা কৃত্রিম আলোর রোশনাই নয়, এখানে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ, নিষ্ঠা ও বংশপরম্পরার ধারাবাহিকতায় বিশুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানে দুর্গোৎসব নয়, অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা। পাঁচশো বছরের প্রাচীন বনেদি বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ আজ শুধু ইতিহাসকেই জীবন্ত রাখেনি, বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটি সনাতন ঐতিহ্যের চিরন্তন ও পবিত্র পাঠশালা রূপে মাথা উঁচু করে বিরাজ করছে।

ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী উর্বর পলিমাটিতে গড়ে ওঠা শস্যশ্যামল, প্রাকৃতিক শোভায় সমৃদ্ধ, সুস্বাস্থ্যকর অনুচ্চ ভূমির ওপর অবস্থিত পাঁচথুপি গ্রামে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাপূজার প্রবর্তন হয়েছিল।

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (কায়স্থ কাণ্ড)' থেকে জানা যায়, উত্তর রাঢ়ীয় সৌকালীন ঘোষ বংশের আদি পুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ অযোধ্যা থেকে এসে কান্দি মহকুমার জজান গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সোমেশ্বর ঘোষের চতুর্দশ পুরুষ সামন্ত রাজা নরপতি ঘোষ পাঁচথুপি গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। অনেকের মতে, রাজা নরপতি ঘোষ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তাঁর রাজবাড়িতে প্রথম দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। রাজা

নরপতির পুত্র প্রয়াগ ঘোষ নবাবের কাছ থেকে ‘মৌলিক’ উপাধি গ্রহণ করে ঘোষ মৌলিক হন। তাঁর সময় থেকেই দুর্গাপূজার জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। পূজার প্রবর্তনকাল থেকেই শাক্ত মতে নিজস্ব পুঁথি অনুসারে ঐতিহ্যপূর্ণ এই দুর্গাপূজা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে।

পাঁচথুপির দুর্গাপূজা শুরু হয় মুখ্য চান্দ্র আশ্বিন মাসের আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে, বোধনের দিন থেকে। ওই দিন বাদ্যসহকারে কৃষ্ণসাগর পুকুর থেকে ঘট ভরে মণ্ডপের ডান দিকে স্থাপন করে ষোড়শোপচারে পূজা, পাঠ, হোমযজ্ঞ ও ছাগ বলিদানের মাধ্যমে দুর্গাপূজার শুভ সূচনা হয়। বোধন থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও শীতলভোগ, দুপুরে লুচি, মিষ্টি ও ফল এবং রাতে ফল, মিষ্টি, দুধ, ছানা, মাখন ও ক্ষীরের ভোগ নিবেদন করা হয়। প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ হয়। আগে বোধন থেকে প্রতিদিন একশো আটটি বিল্বপত্রে হোমযজ্ঞ হতো, বর্তমানে আটাশটি বিল্বপত্রে হোমযজ্ঞ হয়। বোধনের দিন থেকেই গ্রাম্যদেবীর পূজা তর্পণ ও ভোগ নিবেদন করা হয়।

সপ্তমী ও অষ্টমীতে ছাগ বলিদান-সহ পূজা সম্পন্ন হয়। আগে অষ্টমীতে মহাসমারোহে কুমারী পূজা হতো। বর্তমানে কুমারী পূজা বন্ধ রয়েছে। আগে সন্ধিপূজার শুরুতে শিঙা ফুঁকে ও বন্দুকের গুলির শব্দে পূজা শুরুর সংকেত দেওয়া হতো, আরতি ও অঞ্জলি অর্পণের মাধ্যমে মহাষ্টমীর পূজা সম্পন্ন হয়।

নবমী পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনটি ছাগ ও একটি মহিষ বলিদানের পর কুষ্মাণ্ড বলিদান। বলিদান সমাপ্তির পর বাদ্যসহকারে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। এই পূজার উল্লেখযোগ্য রীতি হলো বোধনের দিন থেকে বিজয়া পর্যন্ত তর্পণ ও ভোগ নিবেদন। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ‘গ্রাম ফেরা’। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত দিনের পূজাপাঠ শেষ হওয়ার পর প্রতিদিন বাদ্যযন্ত্র-সহ জমিদার ও পরিবারের সদস্যরা রুপোর ছাতা ও রুপোর দণ্ড হাতে, পাইক-বরকন্দাজ-সহ প্রতিটি পূজামণ্ডপ পরিভ্রমণ করতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি পূজামণ্ডপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও কুশল বিনিময় করা। পূজার দিনগুলিতে পাঁচথুপি-সহ সংলগ্ন গ্রামগুলি পূজার আনন্দে মেতে ওঠে।

এই গ্রামের পূজার আরেক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিরঞ্জন পর্ব। সব প্রতিমা সারিবদ্ধভাবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়, হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে আকাশ-বাতাস আনন্দে মুখরিত করে এবং আতশবাজি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। দেবীর বিসর্জনের পর পরিবারের সদস্যরা চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হয়ে গঙ্গাজলপূর্ণ ঘট স্থাপন করে দক্ষিণাকালীর স্থানে ছাগ বলিদান ও গ্রাম্যদেবীর পূজার পর শান্তিজল গ্রহণ করেন এবং প্রণাম ও আলিঙ্গন পর্ব শুরু হয়।

রাজা নরপতির (ন’ তরফ) ও গোবিন্দদেব (ছোটো তরফ)— এঁদের মধ্যে জমিদারি চার ভাগে বিভক্ত হয়। এই উত্তর রাঢ়ীয় ঘোষ বংশ ও তাঁদের শাখা বংশ— ঘোষ মৌলিক, ঘোষ হাজরা, ঘোষ রায় বংশে বিভক্ত হয়ে পারিবারিক দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ৩০টি পারিবারিক পূজা অনুষ্ঠিত হতো। কালক্রমে ১৩টি পারিবারিক পূজা বন্ধ হয়ে বর্তমানে বড়ো তরফ অর্থাৎ খেড়িবাড়ি, মধ্যম তরফ, ন’ তরফ, মুখার্জি পরিবার, পালদের বাড়ি, পুরাতন বাড়ি, রায়জি বাড়ি, পুরোহিত পাড়া, সিংহদের বাড়ি, বাঁটির বাড়ি, চন্দ্রের বাড়ি ও দত্তদের বাড়ি— এই ১২টি পারিবারিক ও ১২টি বারোয়ারি, মোট ২৪টি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বড়ো তরফ খেড়িবাড়ির পূজা প্রায় পাঁচশো বছরেরও বেশি প্রাচীন। নবমীর মহিষ বলিদানের দিন, আতশবাজি ও বিসর্জনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখার জন্য কান্দি মহকুমা-সহ জেলার হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন।

ইতিহাস যেখানে কথা বলে, সেখান থেকেই সংগৃহীত হয় তথ্য ও দলিল, যা ঐতিহাসিক নিদর্শন রূপে গৃহীত হয়, যা পাঁচথুপির দুর্গাপূজার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই ঐতিহাসিক কারণেই ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত পাঁচথুপির দুর্গাপূজার ওপর ‘পাঁচথুপি : আ ভিলেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’ নামক তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। একটি দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামের সব মানুষ কীভাবে যুক্ত থাকেন ও সংলগ্ন গ্রামের সকল জনসাধারণই এই পূজায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন, ব্লক, মহকুমা ও জেলার হাজার হাজার মানুষ কীভাবে এই পূজায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন, সেই প্রেক্ষাপটে তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয়। এই তথ্যচিত্রটি অনবদ্য ছবি হিসেবে দেশ ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছিল। তথ্যচিত্রটি হিন্দু সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পরম্পরা ও ইতিহাসের অনবদ্য দলিল। মহারাষ্ট্রের বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে এই তথ্যচিত্রটি অন্তর্ভুক্ত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে প্রত্যেক বছর কলকাতা থেকে দু’টি বাসে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্র-ছাত্রীদের পাঁচথুপির দুর্গাপূজা দেখাতে আনা হতো। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির কুমার বসু, অজিত কুমার পাঁজা পাঁচথুপির দুর্গাপূজা দেখতে এসেছিলেন।

পাঁচথুপির দুর্গাপূজা কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি সময়ের স্রোতে টিকে থাকা বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের এক জীবন্ত ইতিহাস। যেখানে আজকের দুর্গাপূজা থিম ও আলোর প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত, সেখানে পাঁচথুপি আজও নিষ্ঠা, শাস্ত্র ও পরম্পরাকে আঁকড়ে ধরে আছে। পাঁচশো বছরের পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপের প্রতিটি ইট, কৃষ্ণসাগরের ঘটভরা জল, ঢাকের বাদ্যি আর রুপোর ছাতা হাতে ‘গ্রাম ফেরা’র দৃশ্য প্রমাণ করে— ঐতিহ্য কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, বর্তমানকে পথ দেখানোর আলো। এই পূজাই শিখিয়ে দেয়, উৎসব মানে বিচ্ছিন্ন আনন্দ নয়, বরং সমগ্র গ্রাম, সমগ্র জনপদের একসূত্রে গাঁথা হয়ে থাকা। যতদিন ময়ূরাক্ষীর জল বইবে, যতদিন শরতের কাশফুল দুলবে, ততদিন পাঁচথুপির এই দুর্গাপূজা পশ্চিমবঙ্গের সনাতন সংস্কৃতির ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতে থাকবে। □



পানাগড়ের নিকটস্থ সোঁয়াই গ্রামে মুখোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা

বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৩৩৪ বছর আগে বঙ্গের বর্ধমান জেলার সোঁয়াই গ্রামটি সংস্কৃত চর্চার এক সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল, যেখানে ২২টি টোল বা পাঠশালা পরিচালিত হতো। প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত হটি বিদ্যালঙ্কারের জন্ম এই গ্রামেই এবং তিনি তাঁর পিতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

কাটোয়ার বাকলসা (ফরিদপুর) গ্রাম থেকে তরুণ ছাত্র বাসুদেব মুখোপাধ্যায় সোঁয়াই গ্রামে আসেন সংস্কৃত ও অন্যান্য পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। শিক্ষা শেষ করার পর তিনি স্থানীয় চট্টরাজ পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করে এই গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

সময়টা ছিল মুঘল হানাদার ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল। ১১০০ বঙ্গাব্দে (১৬৯২-১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে) তৎকালীন কৃষিপ্রধান জীবিকার সঙ্গে যুক্ত বাসুদেববাবু হঠাৎই জানান যে, দেবী দুর্গা তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন বাকলসার পৈতৃক ভিটে থেকে দেবীকে সোঁয়াই গ্রামে এনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

বর্ধমান রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দেবোত্তর সম্পত্তি

স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর বাসুদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর তিন পুত্র— ভবানী, রামনারায়ণ ও রামকিঙ্করকে নিয়ে বাকলসার পৈতৃক ভিটে থেকে দেবীর কাঠের কাঠামো কাঁধে করে সোঁয়াই গ্রামের উদ্দেশে রওনা হন।

কথিত, কাঠামো নিয়ে আসার সময় তৎকালীন বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের (১৬৭৫-১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ) পাইক ও বরকন্দাজেরা রাজকীয় যাত্রাপথ পরিষ্কার করার জন্য তাঁদের সরে দাঁড়াতে বলে। কিন্তু পণ্ডিত বাসুদেব অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে মা দুর্গার পবিত্র কাঠামো নিয়ে তাঁরা পথ ছাড়বেন না, বরং রাজাই যেন সরে দাঁড়ান।

ঘটনা শুনে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণরাম রায় এগিয়ে আসেন। পণ্ডিতের ভক্তি, সাহস ও দেবীর প্রতি নিষ্ঠা দেখে রাজা নিজে প্রণাম করে পথ ছেড়ে দেন। শুধু তাই নয়, সোঁয়াইয়ে মায়ের পূজার জন্য রাজা বিপুল পরিমাণ দেবোত্তর জমি ও সম্পত্তি দান করেন। এইভাবে সোঁয়াই গ্রামের মুখোপাধ্যায় বাড়ির ঐতিহাসিক পূজার সূচনা ঘটে।

দেবীর রূপ ও আচার-অনুষ্ঠান

● **প্রতিমার রূপ :** চিরাচরিত একচালা কাঠামোয় প্রতিমা তৈরি হয়, যেখানে মা দুর্গার মুখটি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মুখের তুলনায় আকারে কিছুটা বড়ো করা হয়। শতাব্দী ধরে একই ঐতিহ্যবাহী রীতিতে মৃন্ময়ী রূপ দেওয়া হয়।

● **কাঠামো পূজা :** রথযাত্রার দিন কাঠামো পূজার মাধ্যমে পূজার শুভারম্ভ ঘটে, যাকে একমাটি বলা হয়।

● **পালকিতে নবপত্রিকা স্নান :** মহাষষ্ঠীতে বোধনের পর মহাসপ্তমীর সকালে পালকিতে করে নবপত্রিকাকে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমেশ্বর মহাদেব মন্দিরের কাছে 'তাঁতপুকুর'-এ ঢাক ও সানাইয়ের সুরে পালকিতে করে নবপত্রিকাকে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

● **ভোগ ও নৈবেদ্য :** সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে দেবীকে যথাক্রমে ৭, ৮ ও ৯টি পৃথক থালায় বিশেষ খাদ্যসামগ্রী নিবেদন করা হয়।

● **মহারাস নৈবেদ্য :** মহাষ্টমীর সন্ধিপূজায় দেবীকে 'রাস নৈবেদ্য' অর্পণ করা হয়। এটি ৬ বস্তা আতপ চাল (৩ বস্তা করে ২ স্থানে), সমপরিমাণ মরসুমি ফলমূল, চিনির কদমা, নবাত ও মণ্ডি দিয়ে শস্যপাত্রের আকারে সাজানো একটি বিশাল নৈবেদ্য। এটি পরিবারের আবহমান কৃষি ঐতিহ্যের প্রতীক।

● **মহাপ্রদীপ :** মহাষষ্ঠীর কল্পারম্ভ থেকে পূজার দিনগুলোতে শুদ্ধ গব্য ঘৃত দিয়ে একটি অখণ্ড 'মহাপ্রদীপ' প্রজ্বলিত রাখা হয়, যা পূজার দিনগুলোতে কখনোই নিষ্প্রদীপ হয় না।

বলিদান প্রথা ও প্রশাসনিক বাধা : শাক্ত মতে আয়োজিত এই পূজায় পশুবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও দেবীকে নিরামিষ ছাড়া অন্য কোনো ভোগ দেওয়া হয় না।

বলির নিয়ম : মহাসপ্তমী ও মহাষ্টমীতে ছাগ বলি দেওয়া হয়। মহানবমীতে মোষ (মহিষ), মেষ (ভেড়া), ছাগ এবং আখ ও চালকুমড়ো বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে।

পঙ্‌ক্তিভোজন ও আনন্দ উৎসব : পূর্বে মহানবমীতে মোষ বলির পর বলিকৃত মোষের দেহটি স্থানীয় জনজাতিদের উপহার হিসেবে দেওয়া হতো (বর্তমানে তা মাটিচাপা দেওয়া হয়)। তবে ছাগল ও ভেড়ার মাংস আগত অতিথিদের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। পূজার ৪ দিন নরনারায়ণ সেবায় সর্বমোট প্রায় ৪ সহস্রাধিক মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। পূজার দিনগুলিতে, সকলের সঙ্গে পরিবারের সদস্য ও অতিথিরা মন্দির প্রাঙ্গণে পঙ্‌ক্তি ভোজন করেন।

বিশেষ নৃত্য ও শোভাযাত্রা : নবমীতে বলিদান পর্বের পর পরিবারের পুরুষ সদস্যরা কপালে রক্তের তিলক এঁকে 'ও মা দিগম্বরী নাচো' গানে দেবীর সামনে নৃত্য করেন। এরপর গান ও নাচ করতে করতে গ্রাম পরিক্রমা করেন। এই শোভাযাত্রা 'জাঁন্ডাতলা' নামক স্থানে গিয়ে শেষ হয়, যেখানে মানুষের সামনে আরও একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়।

নবমীর অপরাহ্নে শিবযজ্ঞের সময় মন্দির প্রাঙ্গণে পরিবারের সকলে একত্রিত হন।

ঐতিহাসিক আদেশ : বলিদানের এই আতিশয্য ব্রিটিশ আমলে কয়েকবার বাধার সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৫ ও ১৯১৬ সালে দুবার এই বলি বন্ধের নির্দেশ জারি করেছিল। তবে পারিবারিক বিশ্বাস ও লোকমুখের কথা অনুযায়ী, তৎকালীন আধিকারিকদের দৈব অনুভূতি ও দুঃস্বপ্নের কারণে নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭-৭৮ সালে জনতা পার্টি সরকারের আমলে তৎকালীন জেলাশাসক বলি বন্ধের উদ্যোগ নিলেও মুখোপাধ্যায় পরিবার যুক্তিসঙ্গতভাবে ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

পারিবারিক পুঁথি ও বিসর্জন

এই পূজায় যে বিশেষ চণ্ডী ও পারিবারিক পুঁথি পাঠ করা হয়, তা বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানী মুখোপাধ্যায়ের নিজের হাতে লেখা।

বিজয়াদশমীতে দেবীর নিরঞ্জন বা বিসর্জন ঘটে। পারিবারিক পুকুরে বিসর্জনের পরপরই পুকুরের জল থেকে মূল কাঠের কাঠামোটি সযত্নে তুলে আনা হয়। পরবর্তী বছর পুনরায় সেই কাঠামোতেই খড় ও মাটির প্রলেপ দিয়ে রঙের ছোঁয়ায় মৃন্ময়ী রূপ দান করা হয়।

পরিবারের পূজায় বিধবা মহিলারা পূজার সমস্ত দায়িত্ব ও কাজে অংশগ্রহণ করেন।

শাস্ত্র ও শস্ত্র : যেভাবে এই গ্রামকে হানাদারদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেছে।

এই পূজা যখন শুরু হয় দেশে তখন মুসলমান হানাদারদের রাজত্ব। এই গ্রামের সংলগ্ন গ্রামগুলিতে যখন প্রবলভাবে সনাতনীদের ধর্মান্তরণ হয়েছে, এই গ্রাম প্রবলভাবে শাস্ত্র ও শস্ত্রের মেলবন্ধনে তা রুখে দিয়েছে। এই পূজার বলিদান এবং বলি-উত্তর নৃত্য-সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বধর্মরক্ষার স্মৃতি বহন করে। এই গ্রামের বর্তমান যুব-প্রজন্ম এই গৌরবের অতীত এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। পরিবার ও গ্রামবাসীদের মতে, এই পূজায় পশু বলি কেবল কোনো নিষ্ঠুরতা নয়, বরং মানুষের অন্তরের কাম ও লোভকে জয় করার এক বিশেষ প্রতীকী রূপায়ণ। ■





বর্ধমান রাজবাড়ির দুর্গাপূজা

ঐতিহ্য, প্রেক্ষাপট ও উপাচারের বহুমাত্রিক মিশ্রণ

অত্রি মল্লিক

রাঢ়বঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য মফস্‌সল শহর হলো বর্ধমান। এই শহরের ইতিহাস স্বকীয়। ইতিহাসের নানা বাঁকে শহর বর্ধমান প্রাসঙ্গিক থেকেছে দীর্ঘ কালাবধি। ঘনঘটাবর্জিত সংস্কৃতির গভীরতা এ শহরের মজ্জাগত। শশব্যস্ত দিনযাপনের প্রকটতায় বর্ধমান তার গৌরবকে হারায়নি আজও। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষের রোজনামচার উপজীব্য হলো এই শহর। বর্ধমানের রাজা ও তাঁর পরিবার দ্বারা পরিচালিত দুর্গাপূজার নানাবিধ তথ্যসহ হরেক বিবরণী বিবিধ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বর্ধমান রাজবাড়ির দুর্গাপূজা এই মর্মে এক স্বল্পালোচিত অ্যাখ্যান।

বর্ধমান রাজবাড়ির এই পূজার আয়োজন একেবারে অন্যরকম। এক সময় লোকজন-পাইক-বরকন্দাজে গমগম করত এই রাজবাড়ি। বাহিরমহল-অন্দরমহলে লোকসমাগমে মুখর হয়ে উঠত প্রাঙ্গণ। তুমুল ব্যস্ততা চারিদিকে। আর স্বাভাবিক নিয়মেই এই ব্যস্ততা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যেত পূজা এলেই। বর্ধমান রাজবাড়িতে তখন তিলধারণের জায়গা থাকত না। এই পূজা প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন। পটে আঁকা মা-দুর্গা পূজিত হন এখানে। পটেশ্বরী দুর্গার বিসর্জনও হতো অনেক আগে। প্রত্যেক বছর নতুন ঘটস্থাপনের মাধ্যমে এই পূজার শুভারম্ভ হয়। লোকসমাগমে এই আনন্দায়োজন যেন আক্ষরিকই পূর্ণতা পেত। আগে মহারাজাধিরাজ উদয় চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পিছনের দিকে এক স্থানে একটি স্থায়ী দুর্গামন্দিরে পটেশ্বরী মা দুর্গাকে স্থাপন করা হতো।

কালের নিয়মানুযায়ী সেই মন্দিরের অবলুপ্তির ফলে পরবর্তীতে বর্তমানের শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ জিউ-র মন্দিরে মা পটেশ্বরী অধিষ্ঠিত হন। এককালে এই পটেশ্বরী দুর্গাপূজায় সুপারি বলি প্রথম প্রচলিত ছিল। সেও এখন বন্ধ বর্তমান মন্দিরে নারায়ণ শিলা, মা চণ্ডীর পূজা হওয়ার কারণে। আজও প্রতিপদের দিনেই ঘট প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই পূজা দশমী পর্যন্ত একনাগাড়ে চলে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষজনের আনাগোনা এখন নেই বললেই চলে। এককালে রাজার রাজত্বে এই পূজার মহিমা ও উদ্‌যাপনের আজ সেসব অতীত। আয়োজন ও আয়তন দুই-ই বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।



বহর ছিল সর্বজনবিদিত। পুরোনো রীতি অবলম্বন করে এখনো অষ্টমী ও নবমীর দিনে পুরি, ছোলা ও হালুয়া ভোগ নিবেদনের পর দর্শনার্থীদের উদ্দেশে বিতরণ করা হয়। পূজার দিনগুলোর সন্ধ্যায় রামায়ণ গান তথা ভক্তিমূলক গানের আসর বসত।

রাজার বংশধর প্রণয় চাঁদ মহতাব শারীরিক অসুস্থতার কারণে সশরীরে বর্ধমান শহরে এই পূজায় এখন আর উপস্থিত না হতে পারলেও আর্থিক সহায়তায় নিজ দায়িত্বে অবিচল থাকেন। এমনকী বর্ধমানের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণসায়রের জলে পটেশ্বরী মা দুর্গার প্রতীকী বিসর্জন করা হতো। বিশেষত্ব হলো, প্রতি বারো বছর অন্তর এই পটেশ্বরী দুর্গার ছবিতে নতুন রঙের প্রলেপ পড়ে। এমনও শোনা যায়, পূজার কয়েকদিন মা দুর্গার জন্য বাহান্ন রকমের ভোগ রান্না হতো। তবে

পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ দুর্গাপূজাই চারদিন ধরে হয়। কিন্তু বর্ধমান রাজবাড়ির এই পূজাতে দশদিন ধরে পূজিতা হন দেবী দুর্গা। মহালয়ার পরের দিন থেকেই বর্ধমান রাজবাড়ির মন্দিরে শুরু হতো দুর্গাপূজা। প্রাচীন আমল থেকেই এই রীতি চলে আসছে। এখানে পটে পূজিতা হতেন দেবী দুর্গা। অর্থাৎ প্রতিমা নয়, পটে আঁকা দেবী দুর্গার ছবিকে পূজা করা হতো। এটাও বর্ধমান রাজবাড়ির পূজার বিশেষত্ব। যা এখনও চলছে। শোনা যায়, তৎকালীন রাজা মহতাব চাঁদের স্বপ্নাদেশের সূত্র ধরেই কোনো মৃন্ময়ী মূর্তিতে পূজা না হয়ে এহেন পটে দেবী পূজিতা হন। শিব-পার্বতীর লোকগাথায় এই পট অপূর্ব। পটের অঙ্কনশৈলী বড়ো অভিনব। দেবীর বাহনের একেবারে অভিব্যক্তি অন্যরকম। পূজার সময় রাজপরিবারের বংশধরেরা উপস্থিত থাকেন বলেই জানতে পারা যায়। একটি সামাজিক বিনোদন

ফঃ ৪

মাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে এও জানতে পারা যায় যে এই পূজায় কোনোকালেই পশুবলির প্রচলন ছিল না। তবে রাজ আমলে কুমড়ো বলি হতো। এখন মণ্ডা বলিও হয়। কিছু বছর আগেও অষ্টমীতে নবকুমারীর পূজা হয়েছে। জানা যায়, কখনো নবমীর রাতে স্থানীয় গুজরাটি মানুষ নবরাত্রি পালন ও ডান্ডিয়া নাচে মেতে ওঠেন।

একসময় বিপুল জৌলুস থাকলেও কালের নিয়মে সেসব আজ অবলুপ্ত। রাজাও নেই, রাজবাড়িও ভগ্নপ্রায়। বেঁচে আছে শুধু রীতি আর নিয়ম, যা মেনেই আজও পূজা হয় দেবী দুর্গার। রাজবাড়ির নাট মন্দিরও ভগ্নপ্রায়। পলেস্তারা খসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে ইট। তার মধ্যেই হয় পটেশ্বরী দুর্গাপূজা। বর্ধমানের মহারাজার হাতেই তৈরি হয়েছিল এই লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ-র মন্দির। কথিত, একসময় পূজা দেখতে নানা জায়গা থেকে ভিড় জমাতেন বহু মানুষ। দামোদর পেরিয়ে আসতেন অনেকে, পায়ে হেঁটে, গোরুর গাড়িতে করে এসে ভিড় জমত মন্দিরের আশেপাশে এই পূজাকে কেন্দ্র করে।

ইতিহাসে এই পূজার বহু তথ্য পাওয়া যায়। স্পষ্ট মনে আছে, ওই ২০০৩-২০০৪ সালের গোড়ার দিকের কথা। বর্ধমান মহারাজার এই লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ-র মন্দির প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শ্রীকৃষ্ণ প্রভাত শাখা হতো। ওই শাখায় কোনো একটি বছরের গুরুপূজন অনুষ্ঠানের দিন আমরা অনেকেই উপস্থিত। জুলাই মাসের বৃষ্টিভেজা ঘাস যেন গালিচা বিছিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজ উড়ছে। পরবর্তীতে ওই মন্দিরের যে অংশে রথ টানা হয় সেই উদ্যানে দামোদর সায়ং ও দামোদর রাত্রি শাখায় সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষের নিত্য শৃঙ্খলাভ্যাস দেখেছি, অংশ নিয়েছি। আমাদের ছোটোবেলায় ঝুলন পূর্ণিমার মেলায় এই মন্দির প্রাঙ্গণে ঘুরতে যাওয়ার কথা প্রতিনিয়ত মনে পড়ে। পাঁপড়, জিলিপি আর বারোভাজা অনাবিল তৃপ্তির স্বাদ এনে দিত। এমনকী রথযাত্রার দিন রথের দড়ি ছুঁয়ে প্রণাম করা, রথ টানা, হইহই— এ সব কিছুরই সাক্ষী আছে এই মহাপ্রাঙ্গণ। তখন আড়ম্বরহীন সামাজিক উৎসবই যেন এ স্থানের বৈশিষ্ট্য ছিল।

শোনা যায়, যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদাদেবীও এই মন্দিরে এসেছেন। প্রবীণ স্বয়ংসেবকদের থেকে জানা যায়, বর্ধমান মহারাজ প্রণয়চাঁদ মহতাবও দাঁড়িয়ে শাখা দেখতেন। অগ্রাংশের ভেঙ্গে পড়া যে রাসমঞ্চ এখন দেখা যায়, ওখানেও বহু অনুষ্ঠান হয়েছে এককালে। ওটি দেখতেও ভারি সুন্দর ছিল। ঝুলন ও রথের সময় একটানা আট দশদিন ধরে মেলা চলত। তখন ওটিই ছিল প্রধান মেলা। লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরের রথটি ছিল রুপোর। বর্তমানে কাঠের রথ টানা হয়। মূল নাটমন্দিরে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হতো। বাড়ির মেয়েরা দোতলার জানালার মধ্যে দিয়ে সেই অনুষ্ঠান দেখতেন। মন্দির সংলগ্ন নীচের মন্দিরে পাতাল ফোঁড়া শিব অর্থাৎ স্বয়ম্ভু এখনো বর্তমান। ওই স্থান থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গও রয়েছে। জানা যায়, ওই পথে রাজপরিবারের সদস্যরা পূজা করতে আসতেন।

অনেক বছর পর গত পূজায় বর্ধমান শহরে অবস্থিত এই মন্দিরে বর্ধমান রাজার প্রতিষ্ঠিত পূজা দেখতে গেলাম। কিঞ্চিৎ বিষাদ ছিল। যেন খাঁ খাঁ করছে সব কিছু। জৌলুসহীন ভাবে নির্জনে দেবী দুর্গার পূজা হচ্ছে। উপাচার ও যত্ন অটুট। আন্তরিকতা ভরপুর। যখন উপস্থিত হলাম, তখন নবমীর কুমারী পূজা চলছে। কোলাহল নেই, আড়ম্বর নেই, ঘনঘটা নেই, উপস্থিত নেই রাজাও। পট আছে, ভগ্নপ্রায় সেই দালানবাড়ি আছে, পটেশ্বরীর পূজাও আছে। অনিত্য জগতে এ যেন মহাশক্তির উপাসনার তথা দুর্গাপূজার এক অবশ্যম্ভাবী আঙ্গিক। ■



LIVE THE UNCROWDED LIFE

JUST 30 PRESIDENTIAL HOMES

ahana is boutique living at its finest — a rare opportunity to own an exceptional esidence in a highly private, exclusive condominium.

KNOW MORE

, 4.5 & DUPLEX | 1 MIN FROM ACROPOLIS MALL | 5.03 CR* ONWARDS

WBRERA/P/KOL/2026/004104 | rera.wb.gov.in | LAND PARTNER nortex 98830 55000 primarcaahana.in PRIMARC AAHANA

হিমের দেশে হৈমবতী জার্মানির দুর্গাপূজা

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

জার্মানিতে প্রবাসী বাঙ্গালিদের সব থেকে বেশি সংখ্যায় একসঙ্গে হওয়ার সুযোগ ঘটে এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করেই। শুধু বাঙ্গালি নয়, তখন আমরা সবাই ভারতীয়। কারণ দুর্গাপূজাতে অংশগ্রহণ করেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ। সেখানে যেমন উত্তর ও



দক্ষিণ ভারতীয় মানুষেরা রয়েছেন, তেমনই আছেন মহারাষ্ট্র বা অসমের মানুষ। দেবী ভগবতী সবারই মা। একেক জায়গায় তিনি একেক রূপে পূজিতা।

অশুভকে দূর করে তিনি শুভ সময়ের সূচনা করেন। অমঙ্গল হরণ করে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। দুঃখ কষ্ট দূর করেন বলেই তিনি 'দুর্গা'। পৃথিবীর আপামর বাঙ্গালির কাছে তিনি ঘরের মেয়ে 'উমা'।

জার্মানির আকাশে অক্টোবরে শরতের পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখা যায় না। দিগন্ত ব্যাপী নীল আকাশ তখন ধূসর হয়ে যায়, কারণ ইউরোপে শরৎ-হেমন্ত মানেই, সূর্য লুকিয়ে যাবে মেঘের আড়ালে। গাছের পাতা কমলা, লাল হতে শুরু করবে, ঠাণ্ডা, হিমশীতল হাওয়া দেবে। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ, কদাচিৎ রোদের ঝিলিক। শাড়ি, গয়না পরে সেজেগুজে পূজার দিন পাতালরেলে বা বাসে চড়ে বসলেই জার্মানরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ সামনে এসে প্রশংসাও করে যায়। ভালোই লাগে। এই কয়েকটা দিনই আমরা বিদেশের মাটিতে ভারতীয়ত্ব দেখানোর সুযোগ পাই। তাই জ্যাকেট, সোয়েটারে সর্বাঙ্গ ঢেকেই আমরা শাড়ি, ধুতি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি পোশাকে দুর্গাপূজার মণ্ডপে উপস্থিত হই।

জার্মানিতে এই পূজাগুলি কোনো কোনো কমিউনিটি সেন্টার বা হিন্দু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষ অনুমতি নিয়ে। ব্যবস্থাপনায় একেকটি পূজার গ্রুপ থাকে যাদের প্রস্তুতি বহুদিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। কারণ মা দুর্গার পূজা তো একটা ছোট্ট বিষয় নয়। সাধ্যমতো সব শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনেই জার্মানিতে পূজা হয়ে থাকে। কোথাও কোনো ত্রুটি যদিও-বা থেকে থাকে

তাতে ভক্তির কমতি ঘটে না। বিদেশে থাকা হিন্দুদের জন্য তাঁদের ঈশ্বর বিশ্বাস, আস্থা, ভরসার জায়গা এইগুলোই। কোথাও গিয়ে হাত জোড় করে সারা বছর লড়াই করার শক্তি চেয়ে নেওয়া যায়। দেশের বাইরে আমাদের এই যাপন, নিজেদের সব ক্ষেত্রে প্রমাণ করা— একরকম সংগ্রাম বই কী।

জার্মানিতে বাঙ্গালির দুর্গাপূজার প্রেক্ষাপট :

জার্মানিতে ভারতীয়দের বসতি গড়ে ওঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বিগত শতাব্দীর ৫০ থেকে ৭০-এর দশক। সেই সময় ছাত্র, গবেষক, প্রশিক্ষণার্থী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের একটি অংশ ভারত থেকে জার্মানিতে আসেন। তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালি, পাঞ্জাবি, তামিল, গুজরাটি ও কেরলীয় উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক ভারতীয় সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে, যেগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সাংস্কৃতিক উৎসবগুলি পালন করা।

ইউরোপে তখন স্থায়ী হিন্দু মন্দিরের সংখ্যাও খুব কম ছিল। ফলে দুর্গাপূজা আয়োজনের জন্য কখনো ব্যক্তিগত বাড়ি, কখনো কমিউনিটি সেন্টার, কখনো ভাড়া করা হতো, এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানার পরিত্যক্ত স্থানও ব্যবহার করা হতো। বার্লিনের হিন্দু সমাজ সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক বিবরণে দেখা যায়, ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে বিভিন্ন ভারতীয় গোষ্ঠী আঞ্চলিক উৎসবকে কেন্দ্র করে সংগঠন তৈরি করেছিল; তাদের মধ্যে Bengalisches Durga-Puja-Komitee-ও ছিল। বার্লিনের দুর্গাপূজার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রধান দুই সংস্থা হলো Berliner Bengalis e.V. যেটি নতুন প্রজন্মের বাঙ্গালি কালচারাল সংস্থা এবং ইগনাইট বার্লিন সার্বজনীন দুর্গোৎসব। এছাড়াও বেদান্ত আশ্রম একটু অন্যরকম দুর্গাপূজার আয়োজন করে থাকে।

হামবুর্গ না বার্লিন, জার্মানির সব থেকে পুরোনো দুর্গাপূজা কোথায় হয়েছিল, এই বিষয়ে আমরা অনুমান করতে পারি হামবুর্গ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। যদিও ধারাবাহিকতার নিরিখে হয়তো বার্লিন এগিয়ে থাকবে।

২০২৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে হামবুর্গের দুর্গাপূজার প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে একটি পারিবারিক স্মৃতির কথা বলা হয়েছে। সেই বিবরণ অনুযায়ী, ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি কলকাতার ব্যবসায়ী কে.সি. দাস তাঁর কন্যা অনুভা নাগের অনুরোধে কলকাতার কুমোরটুলি থেকে একটি দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করিয়ে বিশেষভাবে হামবুর্গে পাঠান। বাক্সবন্দি সেই প্রতিমাই জার্মানিতে পৌঁছেছিল।

পরবর্তী সময়ে হামবুর্গের পূজা ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে ক্রমে সংগঠিত সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়। ১৯৮০-এর দশকের গোড়ায় এটি আরও সংগঠিত রূপ পেতে শুরু করে এবং দশকের শেষের দিকে ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল কমিটি-র মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছর তিথি অনুযায়ী দুর্গাপূজা করা এবং প্রবাসী ভারতীয় তথা বাঙ্গালিদের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে শক্তিশালী করা। সময়ের সঙ্গে এই পূজা শুধু বাঙ্গালিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; ভারতীয় এবং জার্মান দর্শকরাও এর সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন। বর্তমানে 'সংস্কৃত হামবুর্গ' নামে আরেকটি নতুন সংস্থা হামবুর্গে তাদের দুর্গাপূজা শুরু করেছে। এই সংস্থাগুলি শুধু দুর্গাপূজা নয় আরও অনেক পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অনেক রকম সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালন করে।

১৯৮০-র দশকের গোড়া থেকে ব্রেমেনে দুর্গাপূজার আয়োজন হয়ে আসছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি ছিল অপেক্ষাকৃত ঘরোয়া ও পারিবারিক উদ্যোগ; অংশগ্রহণকারী একটি পরিবারের বাড়িতে ভারত থেকে আনা বিশেষ বেদি স্থাপন করে পূজার আয়োজন করা হতো। পরবর্তী সময়ে সেই পারিবারিক পরিসর ক্রমে বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়।

ফ্রাঙ্কফুর্টের ইতিহাসও এই গৌরবময় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। Rhein-Main Bengali Cultural Association e.V. ১৯৮৩ সালে জার্মানিতে বসবাসকারী কয়েকজন ভারতীয় বাঙ্গালির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নতুন দেশে নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখা। সংগঠনের ইতিহাসে বলা হয়েছে, দুর্গাপূজা ছাড়াও এখানে লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, রবীন্দ্রজয়ন্তী ও পয়লা বৈশাখ নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

হামবুর্গের মতোই এখানকার বাঙ্গালিরা ছোটোদের নাচ, গান, ছড়া, আবৃত্তি এবং বড়োদের নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয়রাও যোগদান করেন। ভারতী সমিতি দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি বাংলা পত্রিকাও প্রকাশ করে। যেটি অন্তর্জালে উপলব্ধ।

জার্মানির এই সমস্ত পূজাতেই পাঁচ দিনের কর্মসূচিতে থাকে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পূজা, অঞ্জলি, আরতি, প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দশমীতে নির্জনের পূর্ববর্তী আচার, সিঁদুর খেলাতে মাতেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই।

মিউনিখে দুর্গাপূজার ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো মাতৃ মন্দিরের পূজা। সংগঠনটি বাঙ্গালি সংস্কৃতি, শিল্প, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসারে কাজ করে। ২০২৫ সালে বাভারিয়ান স্টেট্ গভর্নমেন্ট সংগঠনটিকে মিউনিখের হিন্দু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করেছে।

মিউনিখের আর একটি উল্লেখযোগ্য পূজা হলো শারদ সম্প্রীতি। ২০১৪ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালির উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের নিজস্ব ইতিহাস অনুযায়ী, সংগঠনটি মূলত মিউনিখের বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রী, শিল্পী ও চাকুরীজীবী বাঙ্গালিদের একত্রিত করার জন্য তৈরি হয়েছিল। পরে ২০১৮ সালে সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত বৃহৎ আকারে দুর্গাপূজা করার বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ২০১৯ সালে শারদ সম্প্রীতির প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ডুসেলডর্ফের ক্ষেত্রে Indische Gemeinde Dusseldorf e.V. (IGD)-এর দুর্গাপূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগঠনটির নিজস্ব ওয়েবসাইট অনুযায়ী তাদের দুর্গাপূজা ২০১২ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

জার্মানির এই পূজাগুলিতে পরিবেশ থাকে ঘরোয়া। আপনজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার মতো স্নেহের টান অনুভব করে মানুষ। বহু ভারতীয় এখানে জার্মানদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে বা পারিবারিক ও কাজের সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। তাই জার্মানরাও ভারতীয় পোশাকে এই পূজাগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। পূজার ক'টাদিন এই সংগঠনের সদস্যরা নিজেরাই প্রসাদের ফল কাটা, পরিবেশন, ভোগ বিতরণ, ভোগ রান্না এবং অন্য খাবারদাবারের ব্যবস্থা করেন।

দেশের বাইরে এই পূজা ও অনুষ্ঠানগুলিই আমাদের ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির শিকড়। হিন্দু ধর্মের সকলকে এই মহাযজ্ঞে আপন করে নেওয়ার উদারতা আজও সমস্ত পৃথিবীকে মুগ্ধ করে। কারণ একসঙ্গে চলার মূলমন্ত্র তো আমাদের ঋগ্বেদেই দিয়েছে—

'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।।' ঋগ্বেদ ১০।১৯১

সাগরিকা ভট্টাচার্য



মা দুর্গার পবিত্র বৃক্ষরূপ কলাবউ

কলাবউ ও নবপত্রিকা আসলে একই সত্তার দুটি ভিন্ন নাম। সহজ কথায়, নবপত্রিকা হলো দুর্গাপূজার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচার। বঙ্গে একেই আদর করে 'কলাবউ' বলা হয়। তিনি আদৌ গণেশের স্ত্রী নন। তিনি স্বয়ং মা দুর্গারই একটি পবিত্র বৃক্ষরূপ বা প্রতীক। 'নবপত্রিকা'-র আক্ষরিক অর্থ 'নয়টি পাতা' হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি নয়টি বিশেষ উদ্ভিদের একটি পবিত্র সমাহার। দুর্গাপূজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আচারটিতে যে নয়টি গাছ স্থান পায়, সেগুলো হলো— কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান।

গণেশের সঙ্গে সম্পর্ক : পূজার নিয়মানুযায়ী, নবপত্রিকা বা কলাবউকে গণেশ ঠাকুরের ডানপাশে স্থাপন করা হয় এবং লালপাড় শাড়ি পরিয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর রূপ দেওয়া হয়। সাধারণ লোকসংস্কৃতিতে এই কারণেই তাঁকে গণেশের 'বউ' হিসেবে গণ্য করা হয়, যদিও শাস্ত্রীয় মতে তিনি আসলে গণেশের মা (দেবী দুর্গা)।

স্নানের রীতি : দুর্গাপূজার সপ্তমীর সকালে এই নবপত্রিকাকে পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন শাড়ি পরিয়ে মণ্ডপে নিয়ে আসা হয়।

এই নয়টি গাছ বা উদ্ভিদ কেবল সাধারণ কোনো উদ্ভিদ নয়, বরং প্রতিটি গাছ দেবী দুর্গার একেকটি বিশেষ শক্তির বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতীক। শাস্ত্র মতে, এই নয়টি উদ্ভিদ আসলে দেবীর নয়টি রূপেরই প্রতিচ্ছবি।

নবপত্রিকার ৯টি উদ্ভিদ ও তাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী

১. কলা গাছ : দেবী ব্রহ্মাণী

কলা গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ব্রহ্মাণী। তিনি ব্রহ্মের শক্তির প্রতীক। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, দেবী ব্রহ্মাণী হলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শক্তি বা তাঁর সৃষ্টি রূপ। দেবীর গায়ের রং

স্বর্ণাভ বা হলুদ, তাঁর চারটি মুখ এবং তিনি চতুর্ভুজা (চার হাতবিশিষ্ট)। তাঁর বাহন হলো রাজহাঁস। অর্থাৎ, দেবী ব্রাহ্মণী হলেন স্বয়ং সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মারই মূর্ত নারী রূপ বা তাঁরই দিব্য শক্তির প্রকাশ।

২. কচুগাছ : দেবী কালিকা

কচুগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কালিকা। তিনি শত্রুনাশ ও শক্তির প্রতীক। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' বা চণ্ডী অনুযায়ী, রক্তবীজ নামের এক অসুরের সঙ্গে দেবতাদের ভয়ানক যুদ্ধ চলছিল। রক্তবীজের এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে তার থেকে ঠিক তার সমকক্ষ আরেকটি অসুর জন্মাতো। দেবতারা এই অদ্ভুত শক্তির কাছে হেরে যাচ্ছিলেন। তখন অসুরদের বধ করার জন্য দেবী দুর্গা নিজের ভ্রূকুটি বা কপাল কুঁচকে ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন এবং তাঁর ললাট থেকে দেবী কালিকার জন্ম হয়। এরপর দেবী কালিকা তাঁর প্রসারিত জিভ দিয়ে রক্তবীজের সমস্ত রক্ত পান করতে থাকেন, যাতে এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে না পড়ে। এভাবে তিনি অসুরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন।

৩. হরিদ্রা (হলুদ গাছ) : দেবী উমা

হলুদ গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন স্বয়ং উমা। তিনি সৌভাগ্য ও মঙ্গলের প্রতীক। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিতে দেবী উমা হলেন মহাশক্তি বা পার্বতীর অন্যতম প্রধান রূপ। তিনি হিমালয়রাজ হিমবান ও দেবী মেনকার কন্যা। উমা নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়, দেবী যখন কঠোর তপস্যা করার জন্য বনবাসে যেতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁর মা মেনকা ব্যাকুল হয়ে 'উমা' (অর্থাৎ 'ওমা, আর যেও না।') বলে কেঁদে ওঠেন। সেই থেকেই তাঁর নাম হয় উমা।

৪. জয়ন্তী : দেবী দেবসেনা/কার্তিকী

জয়ন্তী গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কার্তিকী। তিনি দেবসেনাপতি কার্তিকের শক্তি ও বিজয়ের প্রতীক। দেবী দেবসেনার স্বামী কার্তিক বলে দেবতা কার্তিককে 'দেবসেনাপতি' বলা হয়। মহাভারত অনুসারে তিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা কিন্তু স্কন্দ পুরাণ অনুসারে তিনি স্বর্গরাজ ইন্দ্র ও দেবী শচীর কন্যা।

৫. বেল গাছ : দেবী শিবা/শিবানী

বেলগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শিবা বা শিবানী। তিনি দেবাদিদেব শিবের শক্তি এবং পরম কল্যাণের প্রতীক। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, দেবী শিবানী হলেন দেবাদিদেব মহাদেবের স্ত্রী এবং আদি পরাশক্তি বা মহাশক্তিরই একটি রূপ। তিনি মূলত দেবী পার্বতী বা দুর্গারই অন্য নাম। 'শিবানী' শব্দের অর্থ হলো 'শিবের স্ত্রী' বা 'শিব থেকে উদ্ভূত'। শিবকে যদি পরম পুরুষ বা চেতনা ধরা হয়, তবে শিবানী হলেন প্রকৃতি বা মহাশক্তি। মহাবিশ্ব সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের ক্ষেত্রে শিবের সঙ্গে তাঁর এই শক্তির মিলন অপরিহার্য।

৬. ডালিম গাছ : দেবী রক্তদন্তিকা

ডালিম গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন রক্তদন্তিকা। তিনি অসুর বধের সময় দেবীর রক্তমুখী ভীম রূপের স্মারক। দেবী রক্তদন্তিকা অসুর বিপ্রচিত্ত বা বৈপ্রচিত্ত এবং তার ১৪ হাজার অসুর সন্তানকে নিজের মুখগহ্বরে গ্রাস করে (খেয়ে) বধ করেছিলেন। অসুরদের ভক্ষণ করার ফলে দেবীর দাঁতগুলো ডালিম বা বেদানার মতো টকটকে লাল রঙ ধারণ করেছিল, আর এই কারণেই তিনি 'রক্তদন্তিকা' নামে খ্যাত হন।

ব্রহ্মার বর ছিল— বিপ্রচিত্তি ও তার ১৪ হাজার সৈন্যকে একই সঙ্গে বধ করা গেলেই কেবল তাদের বিনাশ সম্ভব। দেবী রক্তদন্তিকা সেই শর্ত পূরণ করে সকলকে রক্ষা করেন।

৭. অশোক গাছ : দেবী শোকরহিতা

অশোক গাছের অধিষ্ঠাত্রী বা রক্ষাকর্তা দেবী হিসেবে তাঁর পূজা করা হয়। মূলত সমস্ত শোক ও দুঃখ দূর করে ভক্তদের জীবনে শান্তি ও আনন্দ প্রদান করাই এই দেবীর মূল বৈশিষ্ট্য।

৮. মানকচু গাছ : মা চামুণ্ডা

মানকচুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন চামুণ্ডা। তিনি চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই মহাবিনাশকারী অসুরকে বধ করেছিলেন। দেবী দুর্গার ভ্রূ বা কপালের মাঝের অংশ থেকে অত্যন্ত উগ্র ও ভয়ংকর এক দেবীর জন্ম হয়। দুর্গাপূজার মহাসন্ধিক্ষণ— সন্ধিপূজার সেই পবিত্র ৪৮ মিনিটেই দেবী চামুণ্ডার আরাধনা করা হয়।

৯. ধান (ধান গাছ) : মা লক্ষ্মী

ধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন লক্ষ্মী। তিনি ধন-ধান্য, সমৃদ্ধি ও অন্নপূর্ণা রূপের প্রতীক। মা লক্ষ্মীর চার হাত মানব জীবনের চারটি লক্ষ্য বা পুরুষার্থের প্রতীক— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

এই ঐতিহ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দুর্গাপূজা কেবল দেবীমূর্তির পূজাই নয়— প্রকৃতি, শক্তি ও সৃষ্টির প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের এক অনন্য উৎসব। তাই কলাবউয়ের প্রকৃত পরিচয় জানা মানে বাঙ্গালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে নতুন করে উপলব্ধি করা। □



দুর্গোৎসবকে নিয়ে লোকগান নাচ বা নাটক একসময় গ্রামের মাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে মাটিতে লোকশিল্পটি (নাচ, গান, নাটক যাই হোক) জন্ম নিয়েছে সেখানকার মূল থেকে বিচ্যুতি ঘটলে তার মৌলিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

লোকশিল্পে ও লোকসংস্কৃতিতে মা দুর্গা

বৈশাখী কুণ্ডু

লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিতে মা দুর্গা কেবল একজন পৌরাণিক দেবী নন, তিনি বঙ্গের মাটি, মানুষ ও গ্রামীণ জীবনের এক প্রাণের স্পন্দন। তাই দুর্গাপূজা গ্রাম গঞ্জের মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। দেবী দুর্গার আগমনবার্তায় আনন্দে মেতে ওঠে। লোকশিল্পীরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই সময়ের জন্য। কারণ আনন্দের সঙ্গে তাদের উপার্জনের পথটি সুগম হয়। কিছু লোকশিল্পের আলোচনায় আসা যাক যেখানে মা দুর্গা স্বয়ং বসে আছেন।

১. **আলপনা :** বঙ্গ সংস্কৃতিতে মা দুর্গার আরাধনায় আলপনা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। মণ্ডপের বেদী, মাটি ও রাস্তাঘাট আলপনায় সজ্জিত করে তোলা হয়। দেবীর বেদীতে বা তার চারপাশে পদচিহ্ন, শঙ্খ বা বিভিন্ন আয়ুধের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়। অনেক সময় দেখা যায় মণ্ডপের বাইরে রাস্তা জুড়ে অনেকটা এলাকা নিয়ে কারুকার্য করা হয়। মনে হয় পথেই যেন দেবীর আরাধনা করা হবে।

২. **টেরাকোটা :** পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকে মা দুর্গার বিভিন্ন মূর্তি ফুটিয়ে তোলেন মৃৎশিল্পীরা। দুর্গা মূর্তি ছাড়াও সন্তান সন্ততির মূর্তি, তাঁর সহচরীদের মূর্তি, পৌরাণিক গ্রন্থে মা দুর্গার বিভিন্ন কাহিনি যেমন বর্ণনা করা থাকে তেমনই শিল্পীরা ফুটিয়ে তোলেন। বলা যেতে পারে এই শিল্পকর্মগুলো এক একটি ইতিহাস যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি দৃষ্টান্ত যেখান থেকে তারা গবেষণামূলক কাজ করতে পারে।

৩. **নকশি কাঁথা :** নকশি কাঁথার সঙ্গে দুর্গাপূজার সম্পর্ক রঙিন সুতোর টানে। গ্রাম গঞ্জের মহিলা শিল্পীরা পুরনো শাড়ি, কাপড় ইত্যাদি পরপর পেতে সূঁচ-সুতোর সাহায্যে কাঁথা তৈরি করে। সেই কাঁথায় বিভিন্ন ধরনের নকশা করা হলে তৈরি হয় নকশি কাঁথা। এই কাঁথায় দুর্গার ছবি বা দুর্গাপূজার ছবি সূঁচ-সুতোর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা। অনেক পূজা প্যান্ডেলে তথাকথিত পিছিয়ে পড়া লোকশিল্পটিকে তুলে ধরা হয় নিখুঁত কাজের মধ্য দিয়ে।

৪. **মৃৎ শিল্প :** মাটির তৈরি দেব-দেবী মূর্তি মৃৎ শিল্পীদের হাতে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। দুর্গামূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে দেখা যায় শিল্পীরা প্রথমে খড়, বাঁশ, কাঠ দিয়ে একটি শক্ত কাঠামো তৈরি করেন। এই কাঠামোর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে মূর্তিটি। একে একে শিল্পী দেবী মূর্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থাপন করেন। নিজের মনের ভাব অর্থাৎ তিনি যেভাবে মা দুর্গাকে দেখতে চান সেইভাবেই পূর্ণ রূপ দেন। চক্ষুদান পর্বের শেষে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ মা দুর্গা শিল্পীর সামনে রয়েছেন। তাইতো সারা বিশ্বের কাছে কুমোরটুলি, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের সুনাম রয়েছে। বর্তমানে মা দুর্গার সনাতনী রূপের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূর্তি তৈরি হচ্ছে।

৫. **কাঠশিল্প ও ধাতব শিল্প :** কাঠ শিল্পীরা কাঠ খোদাই করে নানাবিধ পুতুল বা মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করেন। কাঠ নির্মিত দেবী দুর্গা মূর্তি অন্যতম। সপরিবারে দুর্গা মূর্তির বেশ জনপ্রিয়তা আছে। বর্তমানে থিমের পূজাকালে কাঠের তৈরি দুর্গা মূর্তি বা প্যান্ডেলের অন্যান্য শিল্পকর্ম দেখা যায়। ব্রোঞ্জ, পিতল, তামা, সোনা, রুপা বা অন্যান্য ধাতুর তৈরি দুর্গা দেখা যায়। ধাতুর তৈরি প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হলো পিতল, কাঁসা বা সোনা, রুপা, তামা, সিসা, টিন, লোহা, দস্তা ও পারদ— এই আটটি ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত অষ্টধাতু। ধাতু দিয়ে তৈরি হওয়ায় এগুলো অত্যন্ত টেকসই এবং দীর্ঘদিন নষ্ট হয় না। ছোটো আকারের মূর্তি ঠাকুর ঘটে বা পূজার টেবিলে রাখা হয়। এছাড়া বড়ো বড়ো ও আকর্ষণীয় ধাতব প্রতিমা বিভিন্ন পূজামণ্ডপেও স্থাপন করা হয়। সনাতন ধর্মে বাড়িতে পিতল বা ধাতুর দুর্গা মূর্তি রাখা অত্যন্ত শুভ এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. **পটের দুর্গা :** মূর্তির পাশাপাশি পটচিত্রে মা দুর্গার আরাধনা পশ্চিমবঙ্গে এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্য। দুর্গাপূজার রীতিনীতি মেনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পটে মা দুর্গার আরাধনা করা হয়ে থাকে। জমিদার বা ধনাঢ্য পরিবারের সদস্যরাই একসময় পটে আঁকা ছবিতে দুর্গা পূজা করতেন। এটি ঐতিহ্যবাহী এবং ব্যয় সাপেক্ষ বটে। পটের দুর্গা পূজা মূলত পারিবারিক পূজা। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পরে তাদের বংশধরেরা আজও নিজেদের মতো করে সেই ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশেষত রাঢ়বঙ্গে পটের দুর্গা পূজা পাঠের রীতি আছে। জানা যায়, বীরভূমের ১৮টি দুর্গা পূজার মধ্যে ১০টি পটের দুর্গা পূজা হয়।

৭. **চালচিত্র :** প্রতিমার পেছনের অর্ধচন্দ্রাকার চালচিত্রে শিব, দুর্গা ও কৈলাশ শিখরের ছবি আঁকার লোকায়ত শিল্প বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও লোকনাট্যতে দুর্গা আরাধনা—

লোকসঙ্গীত : বাউল সাধকরা অনেক সময় রূপক অর্থে দেবীর আরাধনা করেন। দেহের মধ্যেই পরম আরাধ্যকে পাওয়ার সাধনা প্রকাশ পায় তাঁদের গানে। নদীমাতৃক ও উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতেও দেবীর আগমনী সুর গ্রামীণ সুরের মূর্ছনায় ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। লোকসঙ্গীতে দুর্গা আরাধনা তাই কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাঙ্গালির চিরন্তন আবেগ, পারিবারিক মিলন তথা মিলনোৎসব। গ্রামের মেঠো পথে কান পাতলে মায়ের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। আগমনী গানের মধ্য দিয়ে মায়ের আগমন বার্তায় মর্ত্যবাসীর মধ্যে এক অনাবিল আনন্দের ঝড় বয়ে যায়। এই আগমনী গানের পাশাপাশি বিজয়ার গানও গাওয়া হয় মাকে বিদায় জানানোর সময়।

লোকনৃত্য : মনের আনন্দে, কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছাড়া, প্রকৃতির ডাকে যে নৃত্য হৃদয়ের গভীরে জন্ম নেয় এবং বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকেই নৃত্যবিশেষজ্ঞরা লোকনৃত্যের আখ্যা দিয়েছেন। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পূজা পার্বণে গ্রামবঙ্গের বুকে মানুষজন নৃত্যে মেতে ওঠে। যেমন দুর্গোৎসব। এই উৎসবের অন্যান্য নৃত্যের মধ্যে একটি ধুনুচি নৃত্য। জনপ্রিয়ও বটে। ধুনুচিতে আগুন, নারকেলের ছোবড়া ও ধূপ দিয়ে এটি করা হয়। ঢাকের তালে তালে এই নৃত্য দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধ ও শক্তির বিজয়ের প্রতীক। পুরুলিয়া ও ঝাড়খণ্ডের ছৌ নাচে মহিষাসুর বধ ও শক্তির বিজয়ের প্রতীক। পুরুলিয়া ও ঝাড়খণ্ডের ছৌ নাচে মহিষাসুরমর্দিনী করা হয়। সেখানে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর নৃত্য পরিবেশন করা হয়। আরাধনার নানা রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়। আসামে বিভিন্ন শিল্পীদের কণ্ঠে 'দুর্গা বন্দনা' এবং স্থানীয় লোকসুর ও লোকনৃত্যের ধারা বেশ সমৃদ্ধ। এছাড়া লৌকিক আঙ্গিকে হরগৌরী নৃত্য, ঢাকি নৃত্য ইত্যাদি দেখা যায়।

লোকনাট্য : পৌরাণিক কাহিনি, দেবতার উপাখ্যান বা কোনো সামাজিক কাহিনি যাত্রা বা নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে জনমানসের মনের মধ্যে তার প্রভাব পড়ে। গ্রাম বঙ্গের মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। দেবী দুর্গার বিভিন্ন কাহিনি, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের গল্প, মর্ত্যবাসীর কল্যাণে বিভিন্ন কল্পকাহিনি মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। দুর্গোৎসবের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য বিশেষভাবে সম্পর্কিত। লোকগান নাচ বা নাটক একসময় গ্রামের মাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে কথায়, সুরে ছন্দে। জনপ্রিয়তা লাভের জন্য এই ধারণা জন্মেছে। কিন্তু যে মাটিতে লোকশিল্পটি (নাচ, গান, নাটক যাই হোক) জন্ম নিয়েছে সেখানকার মূল থেকে বিচ্যুতি ঘটলে তার মৌলিকতা নষ্ট হয়ে যায়। □



স্বামী বিবেকানন্দের দুর্গাপূজা

রবিব্রত ঘোষ

১৮৮৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। মহালয়া তখনো দিন পাঁচেক বাকি। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে কথামৃতকার শ্রীম। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত হাজরামশাই ঠাকুরকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন, নরেন্দ্র আগমনী গাইলে। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন কীরকম? নরেন্দ্রনাথকে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, তুই আগমনী গেয়েছিস? নরেন্দ্র ঠাকুরকে গেয়ে শোনালেন সেই গান 'কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই। কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই।'

সমকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কাছে ঘটনাটা অত্যন্ত অভিনব সন্দেহ নেই। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, নিরাকারবাদী ছিলেন। মূর্তিপূজাকে একটা সময় পর্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করেছেন। গুরুকে বাজিয়ে নিয়েছেন। তার অনেক পরে মা কালীকে মেনেছেন, মা দুর্গাকে মেনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হয়েছেন আর ভক্তরা বিস্মিত হয়েছেন নরেন্দ্রনাথের এই পরিবর্তন দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী সূত্রে পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত অধরলাল সেনের। তিরিশ বছর বয়সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এক সময় তাঁর উপরে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের মাত্র তিন বছর আগে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর বেনিয়াটোলা স্ট্রিটের বাড়িতেও বহুবার এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উপস্থিত হয়েছেন দুর্গাপূজাতেও। তাঁর সঙ্গেই এই বাড়িতেই পূজায় আসেন আরও দুই মনীষী— স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেন বাড়ির ঠাকুরদালানে বসেই মোট ২৭টি ভক্তিমূলক গান গেয়েছিলেন তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ বা পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ।

পরবর্তীকালে ঠাকুরের শরীর যাবার পর বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে নবীন সন্ন্যাসীরা থাকতেন তাঁরা (১৮৯৭) প্রতিমার পরিবর্তে ঘটে মা দুর্গার পূজা করতেন। যার পুরোহিত ছিলেন (শশী মহারাজ) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

মা দুর্গার প্রতি বিবেকানন্দের ভক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো তাঁর রচিত অম্বা-স্তোত্রম্ অত্যন্ত ললিত ও সুখপাঠ্য। এই সহজ সংস্কৃতে মা দুর্গার প্রতি তাঁর হৃদয়ে যাবতীয় ভক্তিকে উৎসর্গ করতে পেরেছেন। যা মূলত মা দুর্গা এবং তাঁর বেদান্তনির্ভর আত্ম-উৎসর্গকারী চিন্তার এক আশ্চর্য সমন্বয়।

মা দুর্গা ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে সম্পর্কের অভিনব বিষয় হলো একটা বিস্ময়কর সংবাদ। যেটা বিবেকানন্দ হাজির করতে পেরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলীর কাছে। তখনো পর্যন্ত মা সারদাকে অনেক ভক্তই জানতেন না। মা সারদার পরিচয় অত্যন্ত সাধারণ। ভক্তরা তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী হিসেবেই জানতেন।

এই ধারণা পালটে গিয়েছিল নরেন্দ্রনাথের চিঠিতে, তিনি মা সারদাকে একজন সাধারণ মহিলা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মপত্নী নয়, জ্যান্ত দুর্গা হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। যেটা সেই সময় সমাজ ও মানুষের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলীর কাছেও একটা বিস্ময়কর ঘটনা বললেও কম বলা হয়। একটি চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী শিবানন্দ বা তারক মহারাজ ভক্তমণ্ডলীতে যিনি মহাপুরুষ মহারাজ হিসেবে সুপরিচিত, রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ তাঁকে লিখছেন—

'প্রিয় শিবানন্দ,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম।...

মা-ঠাকরুন কী বস্তু বুঝতে পারনি, এখনো কেউই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? —শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানি ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানি গেলে সর্বনাশ!

...বাবুরামের মা'র বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মা'কে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। ...তোমরা জোগাড় করে এই আমার দুর্গাপূজাটি করে দাও দেখি।...

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।'

এখানে বাবুরাম বলতে স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দকে বোঝানো হয়েছে, যাঁর মা নিয়মিত মৃন্ময়ী

মূর্তিতে দুর্গাপূজা করতেন। একথা বললেও বিবেকানন্দ কিন্তু দুর্গাপূজাকে খুবই ভালোবাসতেন এবং আরও সোজাসাপটা বললে বঙ্গ ও ভারতের বাইরে থাকার জন্য তিনি দুর্গাপূজা উপভোগ পারতেন না। তাঁর দুটি চিঠি থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে স্বামীজী হরিপদ মিত্রকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন তিনি বিগত ৯ বছর ধরে দুর্গাপূজা দেখেননি।

'...আর আমি গত ৯ বছর ধরে দুর্গাপূজা দেখিনি; তাই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি।'

একই সময়ে ক্ষেত্রীর মহারাজা অজিত সিংহকে চিঠি লিখেছিলেন— 'বিগত দশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে আমি বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা দেখিনি, যা সেখানকার এক বিরাট উৎসব। আশা করি এ বছর উপস্থিত থাকতে পারব'। স্বামীজীর এই ইচ্ছে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল বেলুড়মঠে দুর্গাপূজা করার মধ্যে দিয়ে।

১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রতিমার মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্তটি ছিল তাঁর নিজের। বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই তিনি এই ভাবনাটি মনে মনে পোষণ করছিলেন। শিষ্য শরৎচন্দ্রকে রঘুনন্দন স্মৃতি বইটি আনতে বললেন, যেখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার আনুষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজী বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করা হলে স্বামীজী তাঁর শিষ্যকে বললেন, 'এবার আমার দুর্গাপূজা করার ইচ্ছা হয়েছে। খরচ জোগাড় করতে পারলে আমি মহামায়ার পূজা করব।' অনেকেই মনে করেন, বেলুড়মঠে দুর্গাপূজা করার পিছনে একাধিক কারণ আছে। স্বামীজীর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর মতে, এই দুর্গাপূজা আয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রক্ষণশীলদের মন থেকে সমস্ত অপ্রীতিকর সন্দেহ ও সংশয় দূর করা।

কিছু ঐশী কারণের কথাও জানা যায়। দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে স্বামীজী বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা হতে দেখার একটি দিব্যদর্শন লাভ করেন। একই সঙ্গে দুর্গাপূজার চার-পাঁচ দিন আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। তিনি দিব্যদর্শনে দেখলেন, মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে এসে বেলগাছটির (এখন দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে স্বামীজী বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা হতে দেখার একটি দিব্যভাব লাভ করেন। দুর্গাপূজার চার-পাঁচ দিন আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। তিনি দিব্যভাবে দেখলেন, মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে এসে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরের সামনের কাছে থামলেন। এরপরই বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দজীকে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করার ব্যবস্থা করতে বলেন। হাতে সময় ছিল অত্যন্ত অল্প। তার মধ্যেই ব্যবস্থা করা হয়।

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার অনুমতি নেওয়ার জন্য মা সারদা দেবীর কাছে স্বামী প্রেমানন্দকে পাঠানো হলো। বাবুরাম মহারাজ শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে গেলেন এবং শ্রীমা সানন্দে প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। শুধু তাই নয়, মা সারদা স্বয়ং ষষ্ঠীর দিনে অন্যান্য মহিলা ভক্তদের সঙ্গে এসে নিকটবর্তী নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে চলে এলেন। পরবর্তী তিন দিনই মা সারদা পূজায় উপস্থিত ছিলেন।

যেহেতু সন্ন্যাসীরা এই ধরনের আনুষ্ঠানিক পূজা করতে পারেন না, তাই স্বামীজী আদেশ দিলেন যে পূজার সংকল্পটি মা সারদার নামে হবে।

বেলগাছের নীচে বসে স্বামীজী মাকে স্বাগত জানিয়ে আগমনী গান গেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আগমনী গানে প্রকাশিত কোমল অনুভূতির কারণে তা খুব পছন্দ করতেন। বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজার ষষ্ঠীতে স্বামীজী 'গিরি গণেশ আমার শুভকারী' ইত্যাদি আগমনী গান গেয়েছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন মঠে এখনো প্রচলিত।

সপ্তমীর রাতে স্বামীজীর জ্বর হয়েছিল। তাই তিনি পরদিন সকালে পূজায় যোগ দিতে পারেননি। অবশ্য এর পিছনে কাহিনি প্রচলিত আছে যে স্বামীজী মা সারদাদেবীকে যাঁকে তিনি জ্যান্ত দুর্গা বলতেন, তাঁকে জানিয়েছিলেন যে স্বামীজীর শিষ্য ভক্তরা প্রচুর খাটাখাটি করছেন স্বামীজী হয়তো কোনো কারণে ভুল দেখে তাদের খুব বকাবকি করেছেন, তাতে তাঁদের হৃদয়ে বড়ো দুঃখ হবে। সেই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতেই স্বামীজী মা দুর্গার কাছে নিজের শরীরে জ্বরকে আহ্বান করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ সন্ধিপূজার সময় মণ্ডপে নেমে এসে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা গৌরীমা মঠে কুমারীপূজার আয়োজন করেন। প্রথমবারের পূজায় ৯ জন কুমারীর মধ্যে একজন এত অল্পবয়স্কা ছিলেন এবং পূজার সময় এমন ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর কপালে রক্তচন্দন পরানোর সময় স্বামী বিবেকানন্দ শিউরে উঠে বলেছিলেন, 'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো!'

নবমীর রাতে স্বামীজী পূজামণ্ডপে মায়ের উদ্দেশে কয়েকটি গান গেয়েছিলেন— যে গানগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ ভলোবাসতেন এবং স্বয়ং এই ধরনের অনুষ্ঠানে গাইতেন। বিসর্জনের সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ বালকের মতো নৃত্য করেছিলেন; স্বামীজী ও স্বামী প্রেমানন্দ উপরতলা থেকে তা দেখছিলেন। পূজার শেষে স্বামীজী মা সারদার হাত দিয়ে তন্ত্রধারককে ২৫ টাকা দক্ষিণা দিয়েছিলেন। বেলুড়মঠে প্রথমবারের মতো হওয়া দুর্গাপূজা সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজের বক্তব্য জানা যায় দুটি চিঠির মাধ্যমে।

১৯০১ সালের ১১ নভেম্বর তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, 'দুর্গাপূজার পর থেকে আমি খুব অসুস্থ ছিলাম, তাই তোমার চিঠির উত্তর আগে দিতে পারিনি। এখানে আমরা দুর্গার মহাপূজা করেছিলাম, যা প্রায় চার দিন ধরে চলেছিল, কিন্তু হায়, আমি সারাক্ষণ জ্বরে ভুগছিলাম। বিশাল প্রতিমা ছিল এবং পূজাটিও ছিল বিরাট।' সেই একই দিনে তিনি সিস্টার ক্রিস্টিনকেও লিখেছিলেন, 'আমরা মায়ের একটি মাটির প্রতিমা এনেছিলাম, হাজার হাজার মানুষ এই দৃশ্য দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন, প্রথমবারের পূজাতেই বিবেকানন্দ মা সারদার উপস্থিতিতে মৃন্ময়ী মূর্তিতে মা দুর্গার পূজা করে কুমারীপূজার মানবী মূর্তির মধ্যে দেবত্বের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন। □

মা দুর্গা যখন ভারতমাতা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মহাশক্তির আরাধনা

ইতিহাসের কাঠগড়ায় ভারতীয় কমিউনিস্টরা চিরকালই দেশদ্রোহিতা, পরদাসত্ব ও চরম সুবিধাবাদের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকবে, আর মা দুর্গার উপাসক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কোটি কোটি ভারতীয়-হৃদয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন ভারতের চিরকালের মুক্তিসূর্য হিসেবে।

ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

মান্দালয় জেলের অন্ধকার কুঠুরি, দুর্গাপুজা এবং মহাশক্তির আবাহন : শরতের শিউলিঝরা আলো যখন বঙ্গের আকাশ-বাতাসকে এক অলৌকিক আনন্দলোকে ভরিয়ে তোলে, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা মেতে ওঠেন মহামায়ার বন্দনায়। দেবী দুর্গা কেবল সনাতন ধর্মের আরাধ্যা প্রতিমা নন, তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার মহাশক্তি, স্বয়ং 'ভারত মাতা'র জীবন্ত রূপক। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেবী আরাধনার এই জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক রূপটি সবচেয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল



দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনে। ১৯২৫ সালের এক হেমন্তের দিনে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্ষুশূল হওয়ার অপরাধে সুভাষচন্দ্রকে নির্বাসিত করা হয় সুদূর ব্রহ্মদেশের কুখ্যাত মান্দালয় জেলে। সঙ্গী ছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মতো অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা।

জেলে যখন আশ্বিনের শরৎ ঋতু এসে গেল, তখন বন্দি বিপ্লবীদের বুকের ভেতর বেজে উঠলো ঢাকের আওয়াজ। সুভাষচন্দ্র, যাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল এলগিন রোডের পারিবারিক বাসভবনে মায়ের গভীর দেবীভক্তি প্রত্যক্ষ করে, সিদ্ধান্ত নিলেন জেলের অন্ধকার কুঠুরিতেই আয়োজন করবেন দুর্গাপূজার। পূজার বাজেট তৈরি হলো আটশো টাকা, যার মধ্যে বিপ্লবীরা নিজেরাই সংগ্রহ করলেন একশো চল্লিশ টাকা। বাকি ছয়শো ষাট টাকার সরকারি গ্রান্টের জন্য জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর ফিন্ডলের মাধ্যমে রেঙ্গুন সরকারের কাছে আবেদন পাঠানো হলো। কিন্তু ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ও তার পেছনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চমৎকারভাবে সংকলিত রয়েছে এইচ. এন. পণ্ডিতের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু : ফ্রম কাবুল টু দ্য ব্যাটল্ অফ ইম্ফল'-এর পাতায়।

সুভাষচন্দ্র এই অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র গর্জন করে উঠলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের চরম দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামি তুলে ধরে দেখালেন

যে, ইউরোপীয় খ্রিস্টান বন্দিদের বড়দিনের উৎসবের জন্য বার্ষিক বারোশো টাকার বিপুল সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হয়, অথচ হিন্দু বন্দিদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের জন্য সামান্য সাহায্যটুকু করতেও ব্রিটিশ রাজযন্ত্র নারাজ। এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বৈষম্যের প্রতিবাদে এবং পূজার অধিকার আদায়ের দাবিতে মান্দালয় জেলের অভ্যন্তরে নেতাজী ও তাঁর সহবন্দিরা শুরু করলেন ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘট। বিপ্লবীদের এই অনশনের খবর জেলের পাঁচিল টপকে যখন ভারতের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছল, তখন দেশজুড়ে তীব্র গণ-বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। চাপের মুখে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলো ঔপনিবেশিক প্রশাসন। বন্দি প্রতি মাত্র ত্রিশ টাকার একটি সামান্য বরাদ্দ মঞ্জুর করা হলো। অর্থ সামান্য হলেও এটি ছিল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে নেতাজীর এক অসামান্য নৈতিক বা কৌশলগত বিজয়। এই বিজয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করে ডাঃ শিশির কুমার বসু সম্পাদিত 'নেতাজী : কালেক্টেড ওয়ার্ক্স্' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখানো হয়েছে কীভাবে সুভাষচন্দ্র কারাগারের শৃঙ্খলকে নিজের অধ্যাত্ম ও যোদ্ধ তেজে ভেঙে চূর্ণ করেছিলেন।

সেই মান্দালয় জেলের বন্দি শিবিরের ধূসর অন্ধকারের মধ্যে আলোকোজ্জ্বল প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে মহাষ্টমীর দিন সুভাষচন্দ্র তাঁর এক ঐতিহাসিক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আজ মহাষ্টমী। এই পুণ্য তিথিতে বঙ্গের ঘরে ঘরে মৃন্ময়ী রূপের আড়ালে চিন্ময়ী মায়ের পূজা হচ্ছে। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে মান্দালয়ের এই বন্দিশালাতেও মাকে আমরা আবাহন করতে পেরেছি। পূজার এই আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ যখন জেলের এই মৃত ও অন্ধকার পরিবেশকে ক্ষণিকের জন্যও গ্রাস করবে, তখন মনে হবে কারাজীবন আর মোটেও কঠিন নয়।' সুভাষচন্দ্রের নিজের লেখা এই চিঠির অংশটি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম' আত্মজীবনীতে সবিস্তারে নথিবদ্ধ আছে, যেখানে তিনি নিজের কিশোর ও যৌবনকালের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শক্তির আরাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

দেবী দুর্গার দশভুজা রূপটি সুভাষচন্দ্রের কাছে ছিল অসুররূপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহাশক্তির উগ্র প্রতিরোধের নিখুঁত রাজনৈতিক রূপক। সুগত বসু তাঁর রচিত গ্রন্থ 'হিজ ম্যাজেস্টিজ অপোনেন্ট : সুভাষচন্দ্র বসু অ্যান্ড ইন্ডিয়াজ স্ট্রাগল এগেইনস্ট এম্পায়ার' (হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২)-এ বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে সুভাষচন্দ্রের কাছে শক্তির আরাধনা কোনো অন্ধ ধর্মান্ধতা ছিল না, বরং তা ছিল শৃঙ্খলিত 'ভারতমাতা'র দুঃখ মোচনের জন্য শক্তির আবাহন। তিনি প্রায়শই বঙ্গের যুবসমাজকে দেবী দুর্গার দশ হাতের সেই মহাশক্তিশালী অস্ত্র হয়ে ওঠার আহ্বান জানাতেন।

পরবর্তীতে ১৯৪০ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলেও তিনি দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন, যা ছিল মূলত ব্রিটিশদের নাকের ডগায় বিপ্লবীদের এক গুপ্ত প্রতিরোধের গোপন ঘাঁটি। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডঃ অরূপ মিত্র তাঁর গবেষণা নিবন্ধে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, জেলের অভ্যন্তরে দুর্গাপূজা নিছক কোনো পূজা ছিল না— এটি ছিল ব্রিটিশ রাজের তীক্ষ্ণ নজরদারির তলায় দাঁড়িয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তোলার এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদের এক কোডেড বা সংকেতপূর্ণ রূপ।

আবার ১৯৩৮ সালে যখন তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসব' কমিটিরও সভাপতি ছিলেন, তখন মহাষ্টমীর দিন মণ্ডপে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রতিমা-সহ সমস্ত প্যান্ডেল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অনেকে এটিকে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক লক্ষণ মনে করলেও, সুভাষচন্দ্র বসু স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাল ধরেন। তিনি কুমারটুলির প্রতিমা শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে সারারাত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মণ্ডপ ও প্রতিমা পুনরায় তৈরি করান এবং নির্ধারিত সময়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করেন। এই অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তিই ছিল সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী জীবনের মূল চালিকাশক্তি।

অথচ কী নির্মম ট্র্যাজেডি! যে মানুষটি ভারতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সনাতন আধ্যাত্মিক তেজকে বুকে ধারণ করে দেশের মুক্তির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, এদেশেরই একদল স্বঘোষিত 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক শক্তি তাঁকে অবিরত অপমান, কুৎসা ও ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার (সিপিআই) তৎকালীন নেতৃত্ব নেতাজীর এই মহাশক্তি আরাধনা এবং দেশপ্রেমের মহাকাব্যকে অবলীলায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিল। তারা নেতাজীর আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদকে 'ফ্যাসিবাদী রহস্যবাদ' বা 'Fascist Mysticism' বলে উপহাস করেছিল, যার তাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে গবেষক মারিয়া টুমিওত্তোর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ 'স্ট্র্যাটেজি অর ফ্যাসিনেশন? সুভাষচন্দ্র বোস অ্যান্ড দ্য মেকিং অফ সাম্যবাদ' (Taylor & Francis, ২০২৩)-এর পাতায়।

ভারতের কমিউনিস্টদের এই মজ্জাগত বিদ্বেষের ঐতিহাসিক চরিত্রটি চমৎকারভাবে উন্মোচিত হয়েছে নিমাই সাধন বসুর জীবনচরিত গ্রন্থ 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' (Deshnayak Subhas Chandra)-এ। সেখানে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে ভারতের কমিউনিস্টরা স্রেফ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলোতেই নয়, বরং ১৯২০-র দশক ও স্বরাজ পার্টির আদিপর্ব থেকেই সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল আধ্যাত্মিক জাতীয়তার ঘোর বিরোধী ছিল।

এই কমিউনিস্ট বিরোধিতার পদ্ধতিগত ধরন বিশ্লেষণ করে সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক রামস্বরূপ তাঁর 'হোয়ার আর দে : কম্যুনিস্টস্ আন্ডার কম্যুনিজম্' (Where are They : Communists under Communism) নামক বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থে লিখেছেন যে, কমিউনিস্ট রণকৌশল অত্যন্ত সহজ ও ক্রূর; তারা যেকোনো খাঁটি অ-কমিউনিস্ট জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ব্ল্যাকমেল, পরিকল্পিত চরিত্রহনন এবং অবিরত ঘৃণ্য কুৎসার মাধ্যমে সমাজ ও ইতিহাসের চোখে ধূলিসাৎ করতে চায়। তারই ধারাবাহিকতায় এদেশের কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মস্কোর নির্দেশে নেতাজীকে 'ফ্যাসিবাদী দস্যু' ও 'তোজোর কুকুর' বলে চিত্রিত করতে দ্বিধা করেনি।

এমনকী প্রবীণ কমিউনিস্ট সংসদ সদস্য হীরেন মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বো অব বার্নিং গোল্ড : আ স্টাডি অফ সুভাষচন্দ্র বসু' (People's Publishing House, ১৯৭৬)-এ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ভারতীয় কমিউনিস্টরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি এক ভয়ঙ্কর ও অন্ধ আক্রোশ পোষণ করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে এমন কদর্য শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিল যা ছিল চরম ভিত্তিহীন ও দুঃখজনক। দুর্গাপূজার এই পুণ্য শারদীয়া তিথিতে দাঁড়িয়ে আমাদের কর্তব্য সেই লাল কুৎসা ও ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার নথিবদ্ধ সত্যসমূহকে অরুণ শৌরির বিখ্যাত আকর গ্রন্থ 'দ্য ওনলি ফাদারল্যান্ড' এবং সীতারাম গোয়েলের প্রামাণ্য

দলিল 'নেতাজী অ্যান্ড দ্য সিপিআই' (১৯৫৫, কলকাতা) এর মতো আকর সূত্রের কষ্টিপাথরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা।

নেতাজীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের এই চরম বিরোধ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বরং তা ছিল তাদের জন্মগত চারিত্রিক দেউলিয়াপনা। ১৯২০-২৫ সালে তাসখন্দে এবং পরবর্তীতে কানপুরে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি শুরু থেকেই ভারতের মাটি ও মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্কোর কমিন্টার্নের নির্দেশাবলীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক অরুণ শৌরির অত্যন্ত জনপ্রিয় আকর গ্রন্থ ''The Only Fatherland : Communists, 'Quit India' and the Soviet Union''-এর পাতায়। অরুণ শৌরি ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মূল নথি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চেয়ে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ রক্ষা করাটাই ছিল সর্বোচ্চ কর্তব্য।

এই আদর্শগত পার্থক্যের কারণে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিন্টার্নের বিখ্যাত মুখপত্র 'ইনপ্রেকোর' (Inprecor)-এ যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাংগঠনিক খসড়া ইশতাহার— 'ড্রাফ্ট্ প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন' (Draft Platform of Action) প্রকাশিত হয়, তখন থেকেই জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু হয়। এই দস্তাবেজে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী অংশকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছিল। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র বসু এবং জওহরলাল নেহরুর নাম সরাসরি উল্লেখ করে কমিন্টার্ন লিখেছিল যে, ভারতের বিপ্লব ও মুক্তির পথে সবচেয়ে বড়ো ও বিপজ্জনক বাধা হলেন এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সংস্কারকরা, যাঁরা মেহনতি মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। কমিউনিস্টদের দস্তাবেজে নেতাজীকে 'শাম লেফ্ট্ ন্যাশনাল রিফর্মিস্ট' বা 'মেকি বামপন্থী দালাল' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু এই সংকীর্ণতা ও ভারতের বাস্তব ভূমি থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছেদকে তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্'-এ অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত এই গ্রন্থে নেতাজী অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন যে, ভারতের এই তথাকথিত কমিউনিস্টরা দেশের বাস্তব মাটি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং এক কৃত্রিম তাত্ত্বিক জগতে বাস করেন। যখন ভারতের সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ পুলিশের লাঠি ও বুলেটের সামনে বুক পেতে দিচ্ছে, তখন এই কমিউনিস্টরা নিজেদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের কোণে বসে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে 'বুর্জোয়া জমিদারদের লড়াই' বলে উপহাস করছেন এবং পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী করার পরোক্ষ সুবিধা করে দিচ্ছেন। নেতাজীর এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ কমিউনিস্টদের আঁতে ঘা দিয়েছিল, যার প্রতিশোধ তারা নিয়েছিল চল্লিশের দশকের উত্তাল দিনগুলিতে।

১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে যখন ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে, তখন মস্কোর কমিন্টার্নের নির্দেশে কমিউনিস্টরা তাদের অতি-বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি বদলে জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারায় প্রবেশ করার জন্য 'সংযুক্ত মোর্চা' বা 'United Front' গড়ার কৌশল নেয়। এই সময়ে ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রবীণ কমিউনিস্ট সাংসদ ও তাত্ত্বিক হীরেন মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'Bow of Burning Gold : A Study of Subhas Chandra Bose'-এ স্বীকার করেছেন যে, কমিউনিস্টদের তৎকালীন প্রধান মুখপত্র 'National Front' ১৯৩৮ সালের শেষভাগেই প্রথম প্রচার করেছিল যে, সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সভাপতি নির্বাচিত করা হোক। কমিউনিস্টরা ভেবেছিল সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবমূর্তিকে ঢাল করে তারা কংগ্রেসের ভেতর নিজেদের শক্তি বাড়াবে।

কিন্তু এই বাম ঐক্যের মুখোশটি সম্পূর্ণ খুলে যায় ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে। সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হলে কংগ্রেসের ভেতরের দক্ষিণপন্থী অংশ এক ভয়ঙ্কর সংকট তৈরি করে এবং সুভাষচন্দ্রের কার্যনির্বাহী কমিটিকে অচল করে দেয়। এই সময়ে নেতাজী সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট ও এমএন রায়পন্থীদের নিয়ে 'লেফ্ট্ কনসোলিডেশন কমিটি' (Left Consolidation Committee) গঠন করে লড়াই করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ক্ষমতার মেরুকরণ ও গান্ধী অনুগামীদের অনমনীয় মনোভাবের সামনে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্টরা চরম সুবিধাবাদ ও ভীরুতার পরিচয় দেয়। কংগ্রেসের ভেতর নিজেদের অবস্থান নিরাপদ রাখতে তারা এক রাতের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে সম্পূর্ণ একা ফেলে পলায়ন করে। কমিউনিস্টদের এই ঐতিহাসিক জঘন্য নিষ্ক্রিয়তার ফলে নেতাজী সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ১৯৩৯ সালের মে মাসে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের পরও কমিউনিস্টদের কুৎসা থামেনি। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায়ে (Forward Bloc — Its Justification) লিখেছেন যে, বাইরে বাম ঐক্যের বড়ো বড়ো বুলি আওড়ালেও, কমিউনিস্টদের দলীয় পত্রিকা 'National Front' গোপনে ফরওয়ার্ড ব্লককে একটি 'প্রতিবিপ্লবী সংগঠন' হিসেবে চিত্রিত করার নোংরা খেলায় মেতেছিল।

এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ২৮ মার্চ জওহরলাল নেহরুকে লেখা এক সুদীর্ঘ পত্রে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, নেহরুর মতো বামপন্থী মননশীল চরিত্রও কীভাবে তাঁর প্রতি গভীর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছেন এবং সমস্ত বিরোধীদের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি অন্ধ থেকে স্রেফ সুভাষের বিরোধিতাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে তুলেছেন। নেহরু ৩ এপ্রিল এর উত্তরে নিজের ব্যক্তিগত অমিলের কথা স্বীকার করলেও ভারতের বাম আন্দোলনের এই সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘাতকতা সুভাষচন্দ্রের অন্তরকে গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছিল।

আজ কমিউনিস্টদের সেই প্রতিটি প্রচারপত্র, 'পিপ্‌ল্‌স্ ওয়ার' পত্রিকার প্রতিটি পাতা তাদের নিজেদের অপরাধের জ্বলন্ত সাক্ষী হিসেবে ইতিহাসের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত রয়েছে। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেরিতে আসা অনুশোচনা তাদের এই ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার কালো দাগকে ধুয়ে ফেলতে পারবে না। ইতিহাসের কাঠগড়ায় ভারতীয় কমিউনিস্টরা চিরকালই দেশদ্রোহিতা, পরদাসত্ব ও চরম সুবিধাবাদের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকবে, আর মা দুর্গার উপাসক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কোটি কোটি ভারতীয়-হৃদয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন ভারতের চিরকালের মুক্তিসূর্য হিসেবে। □



নীতিপঙ্গুত্বের অবস্থান থেকে সরে এসে ভারত এখন সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী এবং ভারতের জাতীয় স্বার্থকে সবার আগে স্থান দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে যুগের বিবর্তন

কংগ্রেস বনাম বিজেপি শাসনকালের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সুমন সরকার

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি তার অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভূ-রাজনৈতিক আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায়। স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (আইএনসি) সরকার এবং গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) সরকার ভারতের বৈশ্বিক সম্পর্ককে নিজস্ব আদর্শ ও কৌশলে পরিচালিত করেছে। কংগ্রেস আমলের শান্ত, কৌশলগত এবং প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক নীতি থেকে শুরু করে বিজেপি আমলের দৃশ্যমান, আক্রমণাত্মক এবং বহুমুখী অ্যালাইনমেন্টের নীতি— দুই যুগের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে এক বিশাল বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিবেদনে দুই আমলের ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হলো।

১. আদর্শগত ভিত্তি : নেহরুভিয়ান বাস্তববাদ বনাম বিশ্বমঞ্চে বিশ্বগুরু :

কংগ্রেস আমলের দীর্ঘ ইতিহাসজুড়ে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়েছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রবর্তিত 'জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন' (এনএএম)-এর মাধ্যমে। এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময় দুটি বিশ্ব পরাশক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখা এবং উপনিবেশবাদ-বিরোধী বিশ্ব গঠনে নেতৃত্ব দেওয়া। মনমোহন সিংহের শাসনকালে এটি 'মনমোহন ডকট্রিন' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, যার লক্ষ্য ছিল শান্ত কূটনীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।

বিপরীতে, বিজেপি শাসনকালের কূটনীতি পুরোপুরি বাস্তবসম্মত এবং বহুমুখী স্বার্থভিত্তিক। মোদী সরকার নামমাত্র জোটনিরপেক্ষতা ত্যাগ করে 'বহুমুখী অ্যালাইনমেন্ট' নীতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ভারতের লক্ষ্য কেবল আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা নয়, বরং বিশ্বমঞ্চে 'বিশ্বগুরু' (Leading Power) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। বিজেপি কূটনীতিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (যেমন : পঞ্চামৃত নীতি— সম্মান, সংবাদ, সমৃদ্ধি, সুরক্ষা ও সংস্কৃতি) সমন্বয়ে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে বিশ্বজুড়ে উপস্থাপন করেছে।

২. দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রূপান্তর : বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমি বিশ্ব :

কংগ্রেস আমলের শেষভাগে ২০০৮ সালে ভারত-মার্কিন ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি (Civil Nuclear Deal) স্বাক্ষরিত হয়, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক বিশাল মাইলফলক ছিল। তবে কংগ্রেসের নীতি ছিল অনেকটা সাবধানী, যাতে রাশিয়া বা অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট না হয়।

বিজেপি শাসনকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত সম্পর্ক এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছে। ভারত এখন আমেরিকার একটি অন্যতম প্রধান কৌশলগত অংশীদারিত্বে অত্যন্ত জোরালো হয়েছে। এর পাশাপাশি ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের মতো পশ্চিমি

দেশগুলির সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারত অত্যন্ত সরাসরি ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

রাশিয়া

কংগ্রেস শাসনকালে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং পরবর্তীতে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং অনেকটা একচেটিয়া। ১৯৭১ সালের ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি এর অন্যতম উদাহরণ। বিজেপি শাসনকালে আমেরিকা ও পশ্চিমি বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়লেও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে ধরে রাখা হয়েছে। ইউক্রেন সংকটের মতো বৈশ্বিক চাপ থাকা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় অপরিশোধিত তেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন ভোটে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে, যা বিজেপির 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' (Strategic Autonomy)-এর ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

৩. প্রতিবেশী নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা : শান্ত কূটনীতি বনাম আঘাতের বদলে পালটা আঘাত :

প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই আমলের বৈসাদৃশ্য সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট।

● **পাকিস্তান :** ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে ২৬/১১ সন্ত্রাসী হামলার পর মনমোহন সিংহের কংগ্রেস সরকার বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানকে কূটনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার এবং চরম সংযম প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বিজেপি শাসনকালে এই রণকৌশল পুরোপুরি বদলে যায়। উরি ও পুলওয়ামা হামলার পর ভারত যথাক্রমে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' এবং 'বালাকোট বিমান হামলা'-র মাধ্যমে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সরাসরি আঘাত হানে। সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না— এই দাবিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

● **চীন :** কংগ্রেস শাসনকালের নীতি ছিল ডোকলাম বা লাদাখের মতো সীমান্ত বিরোধের পরেও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সচল রাখা। তবে ২০২০ সালে গলওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের পর বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্র সরকার চীনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। টিকটক-সহ শতাধিক চীনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়, চীনা বিনিয়োগের ওপর কড়া নজরদারি চালানো হয় এবং সীমান্তে পরিকাঠামো উন্নয়নে অভূতপূর্ব গতি আনা হয়।

● **অন্যান্য প্রতিবেশী :** কংগ্রেসের শাসনকালে আঞ্চলিক রাজনীতিতে অভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলির (যেমন পশ্চিমবঙ্গের কারণে তিস্তা চুক্তি বা তামিলনাড়ুর কারণে শ্রীলঙ্কা নীতি) অনেক প্রভাব ছিল। বিজেপি শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথমে 'Neighbourhood First' নীতি নিলেও নেপাল, মালদ্বীপ বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পালাবদলের কারণে এই অঞ্চলে চীন ও ভারতের প্রভাব বিস্তারের এক তীব্র প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে।

৪. বহুপাক্ষিক ফোরাম ও বিশ্ব নেতৃত্ব :

কংগ্রেস শাসনকালে ভারত বিশ্বমঞ্চে তার নৈতিক অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করত এবং জাতিসঙ্ঘের মতো প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোর মধ্যে কাজ করত। বিজেপি শাসনকালে ভারত বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোকে নিজস্ব অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছে। ২০২৩ সালের জি-২০ সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করে ভারত গ্লোবাল সাউথ বা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়াও ব্রিকস ও সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও)-র মতো জোটেও ভারত এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভূমিকা পালন করছে।

৫. জন কূটনীতি ও অনাবাসী ভারতীয় নেটওয়ার্ক :

কংগ্রেস শাসনকালের কূটনীতি ছিল মূলত আমলাতান্ত্রিক এবং পর্দার আড়ালের। সাধারণ মানুষের কাছে পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব খুব একটা দৃশ্যমান হতো না। বিজেপি শাসনকালে কূটনীতিকে সরাসরি জনসমক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি অনাবাসী ভারতীয়দের ভারতের জাতীয় স্বার্থে ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত সফল। আমেরিকার 'হাউডি মোদী' বা ব্রিটেনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের মতো মেগা ইভেন্টগুলোর মাধ্যমে অনাবাসী ভারতীয়দের ভারতের সফট পাওয়ারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে।

দুই শাসনকালের তুলনামূলক সারসংক্ষেপ বিষয় : কংগ্রেস শাসনকাল (ইউপিএ)। বিজেপি শাসনকাল (এনডিএ)।

মূল দর্শন : জোটনিরপেক্ষতা (এনএএম), কৌশলগত সংযম, শান্ত কূটনীতি। বহুমুখী অ্যালাইনমেন্ট, জাতীয় স্বার্থভিত্তিক বাস্তববাদ, বিশ্বগুরু ভাবমূর্তি।

আমেরিকা নীতি : সম্পর্কের নতুন সূচনা (পরমাণু চুক্তি), তবে কিছুটা সতর্ক অবস্থান। গভীর কৌশলগত ও সামরিক অংশীদারিত্ব (কোয়াড জোট)।

পাকিস্তান ও জাতীয় নিরাপত্তা : কূটনৈতিক চাপ, আন্তর্জাতিক স্তরে নালিশ, সামরিক সংযম। প্রত্যক্ষ সামরিক জবাব (সার্জিক্যাল ও এয়ার স্ট্রাইক), কঠোর নীতি।

কূটনীতির ধরন : প্রাতিষ্ঠানিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। উচ্চ-মাত্রার রাজনৈতিক প্রচার, ব্যক্তিগত মোদী-কূটনীতি।

বৈশ্বিক ভূমিকা : উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ। গ্লোবাল সাউথের স্পষ্ট নেতৃত্ব এবং বৈশ্বিক অ্যাজেন্ডা নির্ধারণকারী।

সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি :

সমালোচকদের মতে, কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতি অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে চলত, যা দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা প্রদান করত। অপরদিকে, বিজেপির পররাষ্ট্রনীতি অনেক বেশি অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রচার ও জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত (Foreign policy as a continuation of domestic politics)। সমালোচকদের দাবি, অতিরিক্ত প্রচারের কারণে অনেক সময় প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ঐতিহ্যগত গভীরতা হ্রাস পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও পারমাণবিক ভিত্তির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। বিজেপি পরিচালিত সরকার সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভারতকে অনেক বেশি সাহসী, আত্মবিশ্বাসী এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এক বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। নীতিপঙ্গুত্বের অবস্থান থেকে সরে এসে ভারত এখন সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী এবং ভারতের জাতীয় স্বার্থকে সবার আগে স্থান দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী, যা একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনীতিতে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond



ব্রিকস সম্মেলন এবং ভারতের প্রভূত প্রাপ্তি

ব্রিকসের প্রকৃত তাৎপর্য হলো— একটি বহুমেরু, অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

ডঃ সুতনু সামন্ত

ব্রিকস হলো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান অর্থনীতি ও 'গ্লোবাল সাউথ'-এর দেশগুলির একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মঞ্চ। এর মূল উদ্দেশ্য হলো— অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উন্নয়ন, প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, জলবায়ু ও আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থায় সদস্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। ব্রিকস কোনো সামরিক জোট নয় এবং ন্যাটো-র মতো কোনো কালেক্টিভ ডিফেন্স বা পারস্পরিক সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নেই। ২০০১ সালে গোল্ডম্যান স্যাক্স-এর অর্থনীতিবিদ জিম ও'নিল প্রথম ব্রিক (BRIC) শব্দটি ব্যবহার করেন। BRIC-এর চারটি অক্ষর এসেছে B = Brazil (ব্রাজিল), R= Russia (রাশিয়া), I = India (ভারত), C = China (চীন)। South Africa (দক্ষিণ আফ্রিকা)-র অন্তর্ভুক্তির পর ব্রিক-এর নামকরণ হয় 'ব্রিকস' (BRICS)। ব্রিকসে বর্তমানে ১১টি সদস্য দেশ রয়েছে। এই পাঁচটি মূল সদস্য দেশ ছাড়া বাকি সদস্য দেশগুলি হলো--- মিশর (ইজিপ্ট), ইথিওপিয়া, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি।

ব্রিকসের পূর্ণ সদস্য হওয়া ছাড়াও 'পার্টনার কান্ট্রি' ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ২০২৬ সালের ব্রিকস কাঠামোতে 'পার্টনার কান্ট্রি'র মধ্যে রয়েছে— বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম। 'পার্টনার কান্ট্রি স্ট্যাটাস'-এর মাধ্যমে একটি দেশ ব্রিকসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে, ব্রিকসের পূর্ণ সদস্য না হয়েও। ব্রিকসের সম্প্রসারণের ফলে এটি আর শুধুমাত্র পাঁচটি দেশের সংগঠন নয়, এটি এখন বৃহৎ 'গ্লোবাল সাউথ ইকোনমিক প্ল্যাটফর্ম'-এ পরিণত হয়েছে। ব্রিকস দেশগুলি সম্মিলিতভাবে প্রায়--- বিশ্বের ৪৯.৫ শতাংশ জনসংখ্যা, বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ জিডিপি, বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রায় ২৬ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ জনসংখ্যা, বাজার, উৎপাদন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক শক্তির দিক থেকে 'ব্রিকস' এখন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চ।

ব্রিকসের প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে— আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা, উন্নয়ন খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে সহযোগিতা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও ওষুধ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু ও সুষম উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলির ভূমিকা বৃদ্ধি, বিশ্ব ব্যাংক-আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো

ফঃ ৬

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর অধিকতর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। ব্রিকসের সহযোগিতা প্রধানত তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। (১) রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা, (২) অর্থনৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতা ও (৩) বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বা 'people-to-people cooperation'।

ব্রিকস - ২০২৬— নয়াদিল্লি সম্মেলন : ২০২৬ সালের ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন গত ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ২০২৬ সালের ব্রিকস সভাপতিত্বের মূল থিম (বিষয়ভাবনা) ছিল— 'সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও সুষম উন্নয়নের জন্য নির্মাণ'। ২০২৬ সালের ব্রিকস সম্মেলন ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ছিল ভারতের চতুর্থ ব্রিকস-সভাপতিত্ব। ভারত এর আগে ২০১২, ২০১৬ ও ২০২১ সালে ব্রিকসের সভাপতিত্ব করেছিল।

২০২৬ সালের 'নিউ দিল্লি ডিক্লারেশন' বা 'নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র' : ভারতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের ব্রিকস সম্মেলনের প্রধান প্রাপ্তি হলো— 'নিউ দিল্লি ডিক্লারেশন' বা 'নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র'। এই ঘোষণায় ব্রিকস দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, বাণিজ্য, শান্তি, উন্নয়ন, জলবায়ু, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও 'গ্লোবাল সাউথ'-এর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(১) 'গ্লোবাল সাউথ'-এর অধিকতর প্রতিনিধিত্ব : ২০২৬ সালের নয়াদিল্লি ঘোষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশগুলির আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। বিশেষত, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লুটিও) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশগুলির ভূমিকা বৃদ্ধির দাবি করা হয়েছে। ভারতের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারত দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিজের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের দাবি জানিয়ে চলেছে।

(২) ডব্লুটিও, আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংক সংস্কার : ব্রিকস দেশগুলি--- ডব্লুটিও, আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকে উন্নয়নশীল দেশের ভোটাধিকার বৃদ্ধি-সহ শেয়ারহোল্ডিং রিফর্ম, কোটা রিফর্ম, ইমার্জিং ইকোনমিজ্ (উদীয়মান অর্থনীতি)-এর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি চায়। বিশ্বজুড়ে ভারতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার 'ভোটিং পাওয়ার' এখনও তার অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত গুরুত্বের তুলনায় সীমিত। তাই ব্রিকসের এই দাবি ভারতের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে ভারতের অবস্থান : ২০২৬ সালের 'ব্রিকস ডিক্লারেশন'-এ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়া হয়েছে। ভারতের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভারত দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে চলেছে। 'ব্রিকস ডিক্লারেশন'-এ সন্ত্রাসবাদকে কোনো পরিস্থিতিতেই ন্যায্যতা দেওয়া উচিত নয় বলে জোর দেওয়া হয়েছে। এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপোশহীন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থানকেই আরও শক্তিশালী করে। এমনকী এই ঘোষণাপত্রে ২০২৫ সালে কাশ্মীরে ঘটে যাওয়া পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ রয়েছে এবং এই ঘোষণাপত্রে পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড উল্লেখিত হওয়ার বিষয়টি চীন মেনে নিয়েছে। পাক-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের ইস্যুতে চীনের এই সমর্থন— ভারতের কূটনৈতিক ও কৌশলগত জয়।

(৪) লোকাল কারেন্সি-তে বাণিজ্য : ব্রিকস সম্মেলনে আলোচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলির অন্যতম হলো— বিভিন্ন দেশের স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য বা 'লোকাল-কারেন্সি সেট্‌ল্‌মেন্ট'। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে প্রচলিত ব্যবস্থায় ভারত-রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা লেনদেনের ব্যবস্থাটি হলো— ভারতীয় মুদ্রা— মার্কিন ডলার— রাশিয়ান মুদ্রা। অর্থাৎ ভারতীয় টাকা প্রথমে মার্কিন ডলারে এবং পরে রাশিয়ান রুবলে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। 'লোকাল কারেন্সি' ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারতীয় টাকা সরাসরি রাশিয়ান রুবলে পরিবর্তিত হবে। এর ফলে দু'টি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন সরাসরি ও সহজতর হয়ে উঠবে।

(৫) লোকাল কারেন্সি ব্যবস্থার সুবিধা : এই ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে আগামীদিনে ডলার-কনভার্শন কস্ট, ট্রানজ্যাকশন কস্ট কমার সম্ভাবনা রয়েছে। পেমেন্ট সেট্‌ল্‌মেন্ট দ্রুত হতে পারে, মার্কিন ডলারের উপর বিভিন্ন দেশের নির্ভরতা কমবে, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা বা ডলার শর্টেজ-এর ঝুঁকি কিছু ক্ষেত্রে কমতে পারে; ব্রিকস সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

(৬) ব্রিকসের মধ্যে বর্তমান বাণিজ্যের পরিমাণ : সম্প্রতি ব্রিকসের সদস্য দেশগুলির মধ্যে 'মার্চেন্ডাইজ্ ট্রেড' ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী— ২০০৩ সালে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪ সালে এই বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.১৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এই বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ব্রিকসের মধ্যে এতগুলি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও 'ইন্ট্রা-ব্রিকস ট্রেড' এখনও বিশ্ব বাণিজ্যের ৫ শতাংশের কাছাকাছি। এর অর্থ হলো— ভবিষ্যতে ব্রিকসের সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

(৭) ভারতের ব্রিকস-বাণিজ্য : ব্রিকস সদস্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য দ্রুত বাড়ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ব্রিকস দেশগুলিতে ভারতের মার্চেন্ডাইজ্ এক্সপোর্ট-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪ সালে ব্রিকস সদস্য দেশগুলিতে ভারতের সার্ভিসেস্ এক্সপোর্ট দাঁড়িয়েছে ৩১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি বৃদ্ধির এই তথ্য ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বে একটি বিশাল বাজার তৈরির পক্ষে সহায়ক।

(৮) ব্রিকস ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক : ব্রিকসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো--- নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

(এনডিবি)। এটি সাধারণভাবে 'ব্রিকস ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' নামেও পরিচিত। এনডিবি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালে। চীনের সাংহাইতে এই ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত। ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ১৪১টি প্রকল্প এনডিবি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে; এনডিবি-র কিউমুলেটিভ অ্যাপ্রুভাল-এর পরিমাণ— ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; লোকাল কারেন্সি ফাইন্যান্সিং প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। এই পরিসংখ্যানটি প্রমাণ করে যে, 'এনডিবি' শুধুমাত্র একটি প্রতীকী প্রতিষ্ঠান নয়; বাস্তবে এটি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অর্থায়ন করছে।

ভারত এনডিবি-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বেনিফিশিয়ারি। ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, পরিবহণ, নগরোন্নয়ন, পানীয় জল প্রকল্প, সুষম উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থায়নের একটি উৎস হলো 'এনডিবি'। এর ফলে ভারতের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য ট্র্যাডিশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিং ইনস্টিটিউশন্স-এর পাশাপাশি একটি নতুন 'ফাইন্যান্সিং চ্যানেল' তৈরি হয়েছে।

ব্রিকস থেকে ভারতের প্রধান সুযোগ-সুবিধা : ব্রিকস সম্মেলনের ফলে ভারত অনেকগুলি আর্থিক, কৌশলগত ও কূটনৈতিক সুবিধা পেয়েছে বা পেতে চলেছে।

(১) বড়ো এক্সপোর্ট মার্কেট বা রপ্তানি বাজার : ভারতীয় কোম্পানিগুলির জন্য তৈরি হতে চলেছে একটি বিশাল বাজার। বিশেষত— ফার্মাসিউটিক্যালস্ (ওষুধপত্র উৎপাদন), আই.টি. (তথ্য-প্রযুক্তি), ফুড (খাদ্য), এগ্রিকালচার (কৃষি), হার্বাল প্রোডাক্টস্ (ভেষজ দ্রব্য), নিউট্রাসিউটিক্যালস্ (ঔষধি গুণসম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী), টেক্সটাইলস্ (বস্ত্রশিল্প), ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, অটোমোবাইল (মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প), রিনিউয়েবল্ এনার্জি (পুনর্নবীকরণ শক্তি) ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানিগুলির কাজ ও রপ্তানির সুযোগ বাড়তে পারে।

(২) লোকাল কারেন্সি সেট্‌ল্‌মেন্ট : ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ডলার কনভার্শন-এর খরচ ও কিছু ক্ষেত্রে ট্রানজ্যাকশন রিস্ক কমতে পারে।

(৩) এনার্জি সিকিউরিটি : ব্রিকসের মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশসমূহ।

(৪) ক্রিটিকাল মিনারেলস্ : ইলেক্ট্রিক ভেহিক্‌ল্, ব্যাটারি, ইলেক্ট্রনিক্স, সোলার এনার্জি ও ডিফেন্স টেকনোলজি-র জন্য ক্রিটিকাল মিনারেলস্ বা কিছু দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিকসের সদস্য দেশগুলির মধ্যে এই খনিজ পদার্থগুলির সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি হওয়ার বড়ো সম্ভাবনা রয়েছে।

(৫) ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স : এনডিবি ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সুষম উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

(৬) ভারতের বিশ্বজনীন প্রভাব : ব্রিকস ভারতের— 'গ্লোবাল সাউথ'কে নেতৃত্বদান, ইউ.এন. রিফর্ম (রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কার), রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের দাবি, কাউন্টার-টেররিজম্, ডব্লুটিও রিফর্ম (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সংস্কার), আইএমএফ রিফর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে কূটনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। 'ব্রিকস ডিক্লারেশন'-এ ভারত ও ব্রাজিলের রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। 'ব্রিকস ডিক্লারেশন'-এ নথিবদ্ধ এই দাবিকে চীন প্রথমবার সমর্থন করেছে।

২০২৬ সালে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ব্রিকস-উদ্যোগ : ২০২৬ সালের ব্রিকস সভাপতিত্বে ভারত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(১) ব্রিকস রিস্ক ল্যাব : গুজরাটের গিফ্‌ট্ সিটি-তে একটি 'ব্রিকস রিস্ক ল্যাব' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য— ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, ইকোনমিক রিস্ক, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি ইত্যাদি বিষয়ে ব্রিকস সদস্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

(২) ব্রিকস-এনডিবি নলেজ পোর্টাল : ব্রিকস দেশগুলির উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ও এনডিবি-ফান্ডেড প্রকল্পগুলির বিষয়সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হলো 'ব্রিকস-এনডিবি নলেজ পোর্টাল'।

(৩) এগ্রিকালচারাল কো-অপারেশন : ব্রিকস সদস্য দেশগুলির মধ্যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'এগ্রিকালচারাল কো-অপারেশন'-এর উদ্যোগ নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে গৃহীত হয়েছে।

(৪) ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার : ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার-এর অভিজ্ঞতা ব্রিকস সদস্য দেশগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার উদ্যোগ নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে গৃহীত হয়েছে।

(৫) ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ : অ্যাডভান্সড্ ম্যানুফ্যাকচারিং ও ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ প্রযুক্তিতে ব্রিকস সদস্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(৬) হেল্‌থ্ কো-অপারেশন : ব্রিকস সদস্য দেশগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'হেল্‌থ্ কো-অপারেশন'-এর উদ্যোগ নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

২০০১ সালের একটি অর্থনৈতিক জোটের ধারণা থেকে শুরু হয়ে ২০২৬ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক মঞ্চে পরিণত হয়েছে 'ব্রিকস'। আজ এর গুরুত্ব শুধু ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সম্প্রসারণের মাধ্যমে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিস্তৃত অংশকে একত্রিত করেছে ব্রিকস। বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ৪০ শতাংশ জিডিপি, প্রায় অর্ধেক বিশ্বের জনসংখ্যা এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এর আওতায় থাকায় ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠতে পারে 'ব্রিকস'। তবে ব্রিকস-কে ন্যাটো-র সামরিক বিকল্প বা জি-সেভেন গোষ্ঠীর সরাসরি শত্রু হিসেবে দেখা সঠিক নয়। ব্রিকসের প্রকৃত তাৎপর্য হলো— একটি বহুমেরু, অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। □

সত্যকে লুকোতে মিথ্যা ন্যারেটিভের জাল বোনা

ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য্য

দেশের কয়েকটি বিরোধী দলের রাজনৈতিক জোট হলো— 'ইন্ডিজোট'। গত ২৩ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ওপর ভিত্তি করে তাদের দাবি হলো— এক অসাধারণ ভোট জালিয়াতি করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৫-এর নভেম্বর থেকে ২০২৬-এর মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত এসআইআর প্রক্রিয়ায় সন্ধান পাওয়া যায় অনেক 'আধুনিক ধৃতরাষ্ট্র'-এর। ২৩টি ক্ষেত্রে এক বিশেষ গোষ্ঠীর একশোর ওপর সন্তানের খোঁজ পাওয়া যায়। তো এই বিষয়টিকে কি 'জালিয়াতি'র পর্যায়ে ফেলা যায়? এরাজ্যে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া চলাকালীন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ছেলে, মেয়ে, জামাইয়ের বাবা এক। এছাড়াও পাওয়া যায়— ঠাকুর্দা, বাবা, নাতির বয়সের ফারাক দশ ও ছয় বছর। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা এহেন তথ্য-পরিসংখ্যান দেখে মেডিকেল জগৎ ও আদালত রীতিমতো ভিরমি খাচ্ছিল। সত্যিই অসাধারণ জালিয়াতি! দেখা গেল একই এপিক (সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র) আইডি বারাসাত, গুরুগ্রাম ও চেন্নাইতে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এপিক আইডি নম্বর এক। ভোটার কার্ডটি যার তিনি আবার বর্তমান ছবি-সহ রাজশাহীতে। ইন্ডিজোটের নেতা-নেত্রীদের কাছে অবশ্য একই তো দেশ! তাদের কাছে 'পশ্চিমবঙ্গ' তো বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্ত!

সত্যিই এক অসাধারণ জালিয়াতি! এ বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন অনেকটাই নির্বিঘ্নে হলো। অনেক মৃত ও ভুয়ো ভোটার এবং জীবিত বাংলাদেশি মুমিনরা ভোট দিতে পারলেন না এবার। সত্যিই আফশোসের ব্যাপার!

ভোটের আগে-পরে সীমাহীন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বা মৃতদেহের স্তূপ দেখলো না পশ্চিমবঙ্গ। কেন এই পরিবর্তন? ছিঃ ছিঃ! ভোটের আগে পরে হাজার হাজার হিন্দু বাড়িতে সাদা থান ফেলে আসা আর হিন্দু মহিলাদের দিয়ে পিঠে বানিয়ে খাওয়ার 'খেলা হবে'-টা আর হলো না। শাজাহান-ফিরদৌসিদের নানা, আব্বা, আম্মি, নানি বেহেশত এসে থেকে এসে ভোট দিতে পারলেন না। মুখে বোরখা ঢেকে আমিনারা অনিমার ভোট দিতে পারলেন না। কাসভ এসে কেশবের ভোট দিতে পারল না। সত্যিই অসাধারণ জালিয়াতি!

ছিঃছিঃ জ্ঞানেশ কুমার। ষাট বছর পর মৃতদেহহীন, রক্তপাতহীন নির্বাচন দেখলো পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচনের পরও ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটেনি। সত্যিই লজ্জার কথা! পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস, বিদেশি বাম, তস্কর তোলামূলের কাছে হুমকি, মারদাঙ্গা, ভুয়ো ভোটার, ছাপ্পা ভোট, ব্যক্তিহত্যা, মৃতদেহ মানে হলো— 'স্বচ্ছ নির্বাচন'। সেখানে কিন্তু কাজটা খুব খারাপ করলেন জ্ঞানেশ কুমার। ভোটার কার্ড অনুযায়ী ফতিমা বিবি হচ্ছেন বাবা, সিরাজুল শেখ নাতনি। লিঙ্গসাম্য আটকে ভয়ানক অন্যায় করলেন জ্ঞানেশ কুমার। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা ছিল পি সি সরকারের নানা আজব ম্যাজিকে ভর্তি। ম্যাজিক শো' বন্ধ করে ভুল করলেন জ্ঞানেশ কুমার! অনেক রকমের জালিয়াতি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এ। ইন্ডিজোটের সেটাই দাবি। আবার এইসব সীমাহীন অন্যায় ঘটলো মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে। জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশনের দ্বারা এইসব 'জালিয়াতি' ঠিক নয়, ঠিক নয়!

এই সিস্টেমেই কি তাহলে জ্ঞানেশ কুমার ইন্ডিজোটের দু'টি দলকে জেতালেন কেরলম্ আর তামিলনাড়ু? তার মধ্যে আবার বাঁকিপুর বিধানসভা জয় যেন বিরোধী জোটের স্বপ্নের স্ট্যালিনগ্রাড! দেশজুড়ে জাল এসআইআর-এর প্রতিবাদে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির সরকারের তো পদত্যাগ করা উচিত, ছাড়া উচিত উপরোক্ত রাজ্যগুলির ক্ষমতা। কারণ— 'চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম!' ভোটের আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'ভ্যানিশ কুমার' আখ্যা দিয়ে, ভোটের পর দল বিভাজনের সম্মুখীন হলে নিজের পরিবার ও ঘনিষ্ঠ নেতানেত্রীদের বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য সেই একই ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া— তস্কর দলনেত্রীর অভিধানে 'অসম্ভব' বলে মনে হয় কোনো শব্দ নেই।

ইন্ডিজোটের বীরপুঙ্গবরা মনে করেন দেশজুড়ে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হোক। প্রবল আন্দোলন হোক নির্বাচন কমিশন থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাতে। তারা মনে করেন— কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তারা মনে হয় জানেন না যে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রক হলো কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক— স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নয়; ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে দায়িত্ব থেকে সরাতে হলে সংসদে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাশ করাতে হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ইন্ডিজোটের দাবি— সব চক্রান্তের মূলে এই জ্ঞানেশ কুমার! তাই সুপ্রিম কোর্ট সরিয়ে দিক এই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে। সংসদ নয়, 'রাস্তা' থেকে চলবে গোটা দেশ। আর দেশে রাজ করুক— শুঁয়োপোকা, পঙ্গপাল, আরশোলা! □

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

সরকারের কঠোর অবস্থান জরুরি

ডঃ রানার চট্টরাজ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে অনেক আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্কের ঝড় বইছে। যাদবপুর অত্যন্ত উন্নত স্তরের শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাম, অতি-বাম এবং রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি বাসা বেঁধে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এই গোষ্ঠীর সঙ্গে নেই। তারা মন দিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। তবুও সিপিআই, সিপিআই (এমএল) তথা মাওবাদী ও নকশাল এবং জেহাদিদের অশুভ আঁতাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ও হোস্টেলগুলিতে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। এটা নতুন নয়, ১৯৬৯-৭০ থেকে দীর্ঘ ৫৬ বছর এই পরিবেশ চলছে। এর বিরুদ্ধে কখনো কখনো প্রতিবাদ হয়েছে। পালটা সংগঠন তৈরির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ এই আঁতাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংখ্যালঘু হলেও এরা সুসংগঠিত। এরা বাইরে থেকে বামপন্থী, মাওবাদী ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির মদত পাচ্ছে। মদত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর থেকেও আসছে। একশ্রেণীর অধ্যাপিকা-অধ্যাপক (যারা বামফ্রন্টের শাসনকালে নিযুক্ত হয়েছিলেন) নানাভাবে, এমনকী প্রকাশ্যে এদের সাহায্য করছেন। লক্ষণীয়, রাজ্য-রাজনীতিতে সিপিএম এবং সিপিআই (এমএল) বা মাওবাদী সম্পর্ক তিক্ত। কিন্তু যাদবপুরে তারা বেশ একসঙ্গে বোঝাপড়া করে আছে। এই অশুভ চক্রের কুকীর্তির কিছু তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে—

১. ১৯৭০-এর ৩১ ডিসেম্বর পড়ন্ত সন্ধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেন নকশালদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। সেই দিনটি ছিল তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিন। প্রশাসনিক ভবন থেকে তিনি হেঁটে তাঁর সরকারি বাসভবনে ফিরছিলেন। এই শোচনীয় ঘটনা রাজ্য-রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তখন অরাজক অবস্থায় ছিল।

২. ২০১৪ সালে জনৈকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, এই অভিযোগে কয়েকমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার জেরে উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীকে অপমানিত হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। এই সময় এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী লালপতাকা হাতে নিয়ে যাদবপুর থানার সামনে যে অসভ্যতা করেছিল, সেটা অভাবনীয়। সিপিএম নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে 'হোক কলরব' নাম দিয়ে এই বিধ্বংসী আন্দোলনকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দিয়ে পঠন- পাঠনে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তদন্তের ফলে দেখা যায়, অভিযোগটি ভিত্তিহীন।

৩. ২০১৬-তে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তৎকালীন জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (তিনি আবার সঙ্গীত শিল্পী) গিয়েছিলেন। এসএফআই-মাওবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তিনি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। উপাচার্য ও উপস্থিত পুলিশবাহিনী নীরব দর্শক ছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ভণ্ডুল হয়ে যায়। খবর পেয়ে বিপন্ন মন্ত্রীকে উদ্ধার করবার জন্য রাজ্যপাল জাগদীপ ধনখড় নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন এবং তুমুল বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। তাঁর গাড়িতে কিল, ঘুষি প্রভৃতি মারা হয়। শোনা যায়, সেই দিন কিছু ছাত্র 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়েছিল। রাজ্য প্রশাসনের সক্রিয়তার অভাব সত্যিই দুঃখজনক।

৪. ২০২৫-এর ১ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের একটি সম্মেলন ছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বামপন্থী, অতি-বামপন্থী ছাত্র- ছাত্রীরা এই সম্মেলন পণ্ড করে দেয়। এই দুর্বিনীত দুর্বৃত্তরা সভাস্থলে ঢুকে পড়ে এবং কয়েকটি খালি চেয়ার ছুঁড়তে আরম্ভ করে। কয়েকজন আহত হন। অধ্যাপিকারা নিগৃহীত হন। শাড়ি, ব্লাউজ প্রভৃতি প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলা হয়। কয়েকজন শিক্ষক বেধড়ক মার খান এবং তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সিপিএম বিরোধী কর্মচারী সংসদের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয় ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে প্রকাশ্যে মদ, গাঁজা প্রভৃতি খেতে অনেকেই দেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে বাম-অতিবাম- রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার এই চক্রকে প্রকাশ্যে মদত দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার মদত না দিলেও নরম মনোভাব নিয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সার্বভৌম শক্তির বাইরে নয়। এই ক্যাম্পাস রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির আশ্রয়স্থল হতে পারে না। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের' দোহাই এখানে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিদ্যার্থীর স্বার্থে সরকারের মনোভাব দৃঢ় ও কঠিন হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে, জেহাদি শক্তিকে কঠোর হাতে দমন করা অপরিহার্য। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর বিলম্ব নয়। □

গ্রন্থসমালোচনা

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের নেপথ্য ইতিহাস

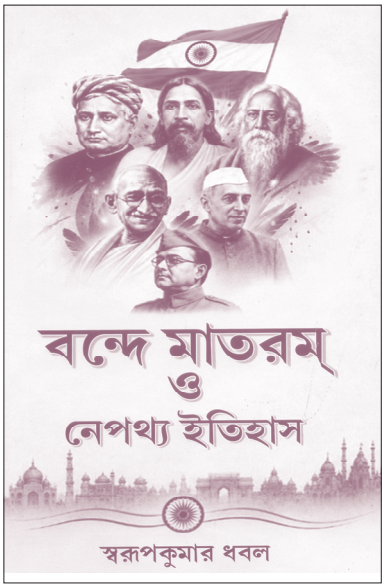

ডঃ পবিত্র দেবনাথ

'বন্দে মাতরম্'— দেড়শো বছর পরেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। যে শব্দবন্ধ ভারতীয় জনজীবনে আবেগ, স্বদেশচেতনা ও বিতর্কের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ, তাকে কেন্দ্র করে লেখা স্বরূপকুমার ধবলের 'বন্দে মাতরম্ ও নেপথ্য ইতিহাস' একটি গবেষণাধর্মী রচনা। একটি সঙ্গীতকে নিয়ে একক প্রচেষ্টায় ২৫৬ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ যে রচনা করা যায় লেখক সেই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। এই গ্রন্থের লক্ষ্য রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতের নেপথ্যে যে দীর্ঘ ইতিহাস কাজ করেছে, তার অনুসন্ধান।

লেখক প্রচলিত তথ্যের পুনরাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকেননি। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচনার প্রকৃত কালখণ্ড, উৎস ও প্রেক্ষাপট, গানটির প্রাথমিক সুরারোপের প্রচেষ্টা এবং পরবর্তী সময়ে তার বিবর্তন— সংবাদপত্র, কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্যবিবরণী, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, ঐতিহাসিকদের তথ্য ও সমকালীন পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন গ্রন্থটির অনুসন্ধানকে একটি দলিলনির্ভর ভিত্তি দিয়েছে।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 'আনন্দমঠ ও বন্দে মাতরম্ প্রসঙ্গ' অধ্যায়টি। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যভাবনা এবং দেশমাতৃকার ধারণার পারস্পরিক সম্পর্ককে এখানে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বের ভূমিকা ধরে সঙ্গীতটির গ্রহণ ও বিরোধিতার ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন লেখক। গ্রন্থের মধ্যে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা এই মহান ব্যক্তিদের পদক্ষেপে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়। ফলে 'বন্দে মাতরম্'-এর ইতিহাস একক কোনো সময়ের ইতিহাস না হয়ে ঔপনিবেশিক ভারত, স্বদেশী আন্দোলন, কংগ্রেস-রাজনীতি এবং স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত একটি বিস্তৃত আখ্যান হয়ে উঠেছে।

তবে এই গ্রন্থের কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বিতর্কের অবকাশ রাখে। বিশেষত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা ও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যায় লেখকের অবস্থান বেশ দৃঢ় ও প্রত্যয়ী।

এই গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন মুসলিম লিগের বিরোধিতার উপলক্ষ্য 'বন্দে মাতরম্' হলেও মূল লক্ষ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ইসলামি শাসনকালের প্রকৃত ইতিহাসের উন্মোচন।

১৯৩৭ আসলে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম্‌কে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই মত প্রকাশ করেছিলেন এবং জওহরলাল নেহরু সাগ্রহে তা গ্রহণ করে কবিগুরুকে শিখণ্ডী বানিয়েছিলেন। তবুও খণ্ডিত বন্দে মাতরম্-কে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা সেদিন দেওয়া হলো না বরং জাতীয় সঙ্গীত তালিকা থেকে কার্যত বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ সালে ২৪ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ব্যক্তিগত বিবৃতি দিয়ে 'জনগণমন'-কে রাষ্ট্রগান ও 'বন্দে মাতরম্'-কে রাষ্ট্রগীত হিসেবে ঘোষণা করে দিলেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনা সাপেক্ষে যা ঘটেনি। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্দে মাতরম্ বিতর্কে কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বেমালুম কিছু ভুল তথ্য পার্লামেন্টে পরিবেশন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। এই গ্রন্থে লেখক তার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন তথ্য সহকারে।

'বন্দে মাতরম্ ও নেপথ্য ইতিহাস' তাই নিছক একটি গানের ইতিহাস নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রতীকের দীর্ঘ যাত্রাপথ অনুসরণ করার প্রয়াস।

স্বরূপকুমার ধবল একাধারে বাঙ্গালি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক; অন্যদিকে, ইতিহাসের আনাচেকানাচে পদচারণ করার একনিষ্ঠ পথিক। এই ত্রিবেণী সঙ্গম ছাড়া 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের নেপথ্য ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। লেখকের এই সাহসী পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। যতদিন ভারতীয় সভ্যতা টিকে থাকবে ততদিন বন্দে মাতরম্ থাকবে আর ততদিন গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তাও থাকবে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে এই গ্রন্থ পাঠ করার অনুরোধ রইলো বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের প্রকৃত ইতিহাসকে জানার জন্য। বন্দে মাতরম্!

পুস্তক : 'বন্দে মাতরম্ ও নেপথ্য ইতিহাস'। লেখক : স্বরূপকুমার ধবল।
প্রচ্ছদ : সমিতা ধবল।
প্রকাশক : তুহিনা প্রকাশনী।
মূল্য : ৩৫০/-। কলকাতা—৭০০০০৯।

কর্মচঞ্চল সঙ্ঘজীবনের আলোয় অনির্বাণ দীপ

দুলাল বর্মা

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-সেবা প্রমুখ তথা মালদা নগরের স্বয়ংসেবক দীপঙ্কর কমল বর্মার পিতৃদেব অপূর্ব কমল বর্মা (দুলাল দা) গত ২৭ সেপ্টম্বর ২০২৬ ভোর ৪টা নাগাদ অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, দুই কন্যা ও দুই পুত্র রেখে গেলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শুভঙ্কর বর্মা জলপাইগুড়িতে ও রায়গঞ্জে প্রায় চার বছর প্রচারক ছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী দিপালি বর্মা ও ২ কন্যা প্রত্যেকে রাষ্ট্র সেবিকা



সমিতির সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত। তার এক পুত্রবধূও আরোগ্য ভারতীর জেলা সভানেত্রী। অপূর্ব কমল বর্মা অবিভক্ত বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৪৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা চার ভাই ও এক বোন ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর পরিবার জলপাইগুড়িতে চলে আসে। তাঁর বাল্যকাল সেখানেই কাটে, জলপাইগুড়িতেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন ও জলপাইগুড়ির পাণ্ডাপাড়া শাখায় মুখ্যশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে মালদায় এসে মালদা জেলা স্কুলে ভর্তি হন, মালদার মঙ্গলবাড়িতে শাখা শুরু করেন। বরেন্দ্র মহকুমা ব্যবস্থা প্রমুখ হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন।

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৬৬ সালে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেই সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সান্নিধ্যে আসেন ও প্রভাবিত হন। সঙ্ঘের প্রচারক শ্রী একনাথ রাণাডের স্নেহাশিস তিনি পেয়েছিলেন। দুলালদা ছাত্র হিসেবেও ভালো ছিলেন। তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন ও সেনাবাহিনীতে কিছুদিন অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙে ইঞ্জিনিয়ার রূপে কাজ করেন। তারপর মালদায় ফিরে এসে ব্যবসায়ী হন ও মঙ্গলবাড়িতে একটি কাঠ চেরাই মিল স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্ঘ জীবনে কালীশঙ্কর চক্রবর্তী ও মনমোহন রায়ের গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি মনমোহনদার নেতৃত্বে পঞ্চানন স্মারক সমিতির কাজকে উত্তরবঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করেন। তিনি ক্ষত্রিয় সমাজকে সংগঠিত ও রাষ্ট্রভক্তি জাগরণের জন্য সারাজীবন সক্রিয় ছিলেন। মালদার মঙ্গলবাড়ি ছিল তাঁর ব্যবসা ও সঙ্ঘ কাজের স্থান। ১৯৮৯ সালে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে মঙ্গলবাড়ি শাখা থেকে অধিক সংখ্যায় বিস্তারক বেরোনোতে তিনি সচেষ্ট ও সফল হন। তাঁর সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা স্বয়ংসেবকরা এখন পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন।

স্বভাবে শান্ত অথচ কর্মচঞ্চল দুলালদা জলপাইগুড়ির পাণ্ডাপাড়া ও মঙ্গলবাড়ির কিশোর ভারতী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিশোর ভারতী পরিষদে সার্বজনীন কালীপূজা প্রচলনে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। বিগত শতাব্দীর ৮০'-র দশকে তৎকালীন হিন্দু বিরোধী বাম সরকারের আমালে বাম-কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও মঙ্গলবাড়ির বুলবুলি মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং এই মোড়ের নামকরণ 'বিবেকানন্দ মোড়' তারই উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। ওই রোডটি 'বিবেকানন্দ রোড' এই নামে ভূষিত করা হয়। এখন ওখানে স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি বিরাজ করছে। তাছাড়া বাচামারি গভর্মেন্ট কলোনির বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। দুলালদা অত্যন্ত সরল স্বভাবের ছিলেন, সব সময় হাসিমুখে কথা বলতেন, সঙ্ঘের কাজে উদীয়মান কার্যকর্তাদের খুব উৎসাহ দিতেন। কথায় কথায় স্বামী বিবেকানন্দের উদাহরণ দিতেন। □

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের উত্তর বিভাগের দক্ষিণেশ্বর নগরের রানি রাসমণি বসতি প্রমুখ শ্রীকান্ত প্রামাণিকের বাবা বিশ্বনাথ প্রামাণিক গত ২২ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি- নাতনিদের রেখে গেছেন।

(১০০)



গল্পকথায় ডাক্তারজী

চির বিদায়

১৯৪০ সালের ২০ জুন। ডাক্তাররা চাইছিলেন সকালেই লাম্বারপাংচার না করে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখার। কিন্তু ডাক্তারজীর কষ্ট, অস্থিরতা বাড়তে থাকায় দুপুরের পরেই ডাঃ হরদাস, ডাঃ চোলকর এবং ডাঃ তত্ত্ববাদী ঘটাটেজীর বাংলোতে এলেন এবং ডাক্তারজীকে দেখে আর সময় নষ্ট না করে লাম্বারপাংচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। সে সময়ের বর্ণনায় আছে লাম্বারপাংচার করার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড থেকে ফোয়ারার মতো জল বেরোতে দেখে ডাক্তাররাও ভয় পেয়ে যান। এই সময় ডাক্তারজীর যে অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছিল তা যাতে বুঝতে পেরে পাশের কার্যকর্তারা কষ্ট না পান সেজন্য তিনি দু'হাতে মুখ ঢেকে রাখেন। দেখা গেল রক্তচাপ অনেক বেড়ে গেছে। চিকিৎসকরা ডাক্তারজীর শরীর থেকে কিছু রক্ত বের করে দিলেন। তবে তাতে তেমন সুরাহা হলো না। এদিকে ক্রমান্বয়ে জ্বর বাড়তে লাগলো। ডাঃ বিধুরে, ডাঃ তত্ত্ববাদী সারারাত ডাক্তারজীর শয্যাপার্শ্বে বসে থাকলেন। রাত ১১টার পর থেকে প্রতি দু-ঘণ্টায় এক ডিগ্রি জ্বর বাড়তে লাগলো। ডাক্তারজীর মুখমণ্ডল জুড়ে গাম্ভীর্য, চিন্তা উদ্বেগের ছাপ। রাত্রি আড়াইটায় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

তারপর দু'-একবার হয়তো কিছু বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সামান্য অস্ফুট শব্দ ছাড়া কিছু বোঝা যায়নি। ২১ জুন সকালে জ্বর ১০৬ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ডাঃ হরদাস, ডাঃ না: ভা: খারকে ডেকে আনা হলো। সমস্ত ডাক্তার মিলেও কিছু করতে পারলেন না। তারা সব আশা ত্যাগ করে অন্তিম সময়ের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। সঙ্ঘের কার্যকর্তা স্বয়ংসেবক থেকে শুরু করে সকলের মধ্যে দাবানলের মতো এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। নাগপুর ভেঙে চললো ঘটাটেজীর বাংলোর দিকে, একটু শেষবারের মতো দেখার জন্য। ততক্ষণে ঈশ্বর ডাক্তারজীর অন্তিম যাত্রার সময় বোধহয় ঠিক করে ফেলেছেন। এক সময় দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হলো— তারপরে থেমে গেলো সব।

সময় তখন সকাল ৯টা বেজে ২৭ মিনিট। চলে গেলেন ডাক্তারজী আমাদের সবাইকে ছেড়ে, দূরে আরও দূরে। শুধু সেদিনকার মতো ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে বলার সুযোগ হলো না— 'এই দেখ আমি চললাম'। একশো থেকে দেড়শো মাইল দূরের স্বয়ংসেবকেরা ছুটে এল ডাক্তারজীকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে। নাগপুরের 'মহারাষ্ট্র' ও 'কাল' পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এই মর্মান্তিক সংবাদ সকলের কাছে পৌঁছে দিল।

বিকেল ৫টায় শবযাত্রা বেরোবার পূর্ব মুহূর্তে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। এক প্রকৃত রাষ্ট্রতপস্বীর বিদায় বেদনা প্রকৃতিও বোধহয় সহ্য করতে পারছিল না। বৃষ্টি কমে গেলে শবযাত্রা শুরু হলো। পুষ্পমাল্যে আচ্ছাদিত ডাক্তারজীর মরদেহ। প্রায় সওয়া মাইল দীর্ঘ শোকযাত্রা। মাঝে মাঝে নাগরিকরা তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ, পুষ্পার্পণ করছিলেন। এই শোকযাত্রায় দল-মত-জাতি-ধর্ম, ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ফরোওয়ার্ড ব্লক, সোশালিস্ট পার্টি, শ্রমিক সংস্থা সমূহ, হরিজন বন্ধুরা, পারসি, খ্রিস্টান, মুসলমান সকলে এই শোকযাত্রায় মিলিত হন। শোকযাত্রায় প্রথমে সাইকেল আরোহী, তারপরে চার লাইনে হাজার হাজার স্বয়ংসেবক। তারপরে অসংখ্য নাগরিক এবং এরপরে ডাক্তারজীর মরদেহ, তার পেছনে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ও অন্য অন্য নেতারা ছিলেন। সবার পেছনে আবার সাইকেল আরোহী দল। ডাক্তারজীর মরদেহের সঙ্গে তাঁর প্রাণপ্রিয় ভগোয়াধ্বজও ছিল। শোকযাত্রা এক সময় রেশিমবাগ-সঙ্ঘস্থানে পৌঁছলো, যে স্থানটি ডাক্তারজীর কাছে ছিল তপোভূমি, সঙ্ঘসাধনা কেন্দ্র। সেখানেই নির্দিষ্ট স্থানে চিতা সজ্জিত হলো। সুউচ্চ মণ্ডপ সজ্জিত চিতায় মরদেহে অগ্নি স্থাপিত করেছিলেন ডাক্তারজীর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা তাত্যাজী হেডগেওয়ার। সঙ্ঘ প্রার্থনা হলো— পূজনীয় আদ্য সরসঙ্ঘচালকের পার্থিব দেহকে উদ্দেশ্য করে শেষ প্রণাম জানালো সকলে। প্রজ্বলিত হলো চিতাগ্নি। ডাক্তারজীর স্বর্গগামী সুবর্ণ জ্যোতির্ময় রথের সঙ্গে সঙ্গে এক মনোমুগ্ধকর প্রার্থনাধ্বনিও এগিয়ে চলল— 'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে'।

(সঙ্ঘের শতবর্ষে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় ডাক্তারজীর চরণকমলে শ্রদ্ধাঞ্জলির দীন প্রয়াস এই পর্বে সমাপ্ত হলো।)

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস